৪

পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও পূর্ববাংলা

ভূমিকা

জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সূত্রপাত করলেও তিনি বেশিদিন তা ভোগ করতে পারেন নি। মাত্র ২০ দিনের মধ্যেই ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন। একই সাথে তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বহাল রইলেন। এক দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থেকে তিনি বেশ কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেন। কিন্তু তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ গণতন্ত্র ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে, দু'অংশের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাঙালি জাতি গড়ে তোলে দুর্বার আন্দোলন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল (১৯৫৮-৬৯) গুরুত্বপূর্ণ।

আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে তথাকথিত পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে বার বার শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থিতিশীল শাসনে বাধা সৃষ্টি করেন। পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া ঘটতে সময় লাগেনি। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। পাকিস্ড়ানি শাসকগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের প্রতি যে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি করে, তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল ৬ ও ১১ দফা। সরকার সর্বাত্মক নির্যাতন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালালেও বরং এই প্রচেষ্টা বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। এবং আইয়ুবের পতনের ঘন্টা বেজে ওঠে।

এই ইউনিট শেষে আপনি আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, ৬ দফা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক নিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১ : আইয়ুব খান ও মৌলিক গণতন্ত্র
- পাঠ-২ : ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন
- পাঠ-৩ : ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ
- পাঠ-৪ : ছয় দফা আন্দোলন
- পাঠ-৫ : সাংস্কৃতিক নিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া
- পাঠ-৬ : আগরতলা মামলা
- পাঠ-৭ : ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন

পাঠ-১

আইয়ুব খান ও মৌলিক গণতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন;*
- *মৌলিক গণতন্ত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারবেন;*
- *মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় গৃহীত স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *এর ফলাফল নির্ণয় করতে পারবেন।*

জেনারেল আইয়ুব ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। তাঁর এই প্রয়াস ইতিবাচক ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তবে অভিনব যে ছিল সে বিষয়ে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর থেকে আইয়ুব খানের ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছরের ভেতরও পাকিস্তানে কোন সাধারণ নির্বাচন হয় নি। ফলে কখনোই জাতীয়ভিত্তিক নির্বাচনী কাঠামো নিশ্চিত হয়নি। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানে একটি নতুন ধরনের নির্বাচনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র যাতে কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট লোকের অধিকারে জাতীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ছিল।

ক. মৌলিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য

আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্র নামক একটি সম্পূর্ন ভিন্ন ধরনের সরকার পদ্ধতি চালু করেন। অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম মত দিয়েছেন যে, আইয়ুবের অনুরোধে ক'জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ এই পদ্ধতির কাঠামো তৈরি করেন। এখন প্রশ্ন হলো আইয়ুব খান কেন এমন পদ্ধতির প্রতি আগ্রহবোধ করলেন। এর কারণ হলো তিনি সংসদীয় পদ্ধতিকে অপছন্দ করতেন এবং মনে করতেন পাকিস্তানের মত একটি দেশে সংসদীয় পদ্ধতি অচল। এখানে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র অচল বলে তিনি মনে করতেন। সুতরাং এদেশের উপযোগী একটা নতুন মডেল তৈরির উদ্দেশে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করেন, মৌলিক গণতন্ত্র চালুর মাধ্যমে আইয়ুব খান সারা দেশে একটি ক্ষমতার বলয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের বর্ণনা

১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবরের ঘোষণা অনুসারে পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। এর মাধ্যমে দেশে একটি চার স্তর বিশিষ্ট পিরামিড আকৃতির কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। স্তরগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল। ছোট ছোট শহরে টাউন কমিটি এবং বড় বড় শহরে পৌরসভা গঠনের বিধান করা হয়। এই কাঠামোর সর্ব নিম্নস্তর ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং পৌরসভা বা টাউন কমিটি জনগণের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। এর ওপরের স্তরগুলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে গঠিত ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের সর্ব নিম্নস্তরে যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান মিলে। এদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার। এদেরকে বেসিক ডেমোক্রাট বা সংক্ষেপে বি.ডি. মেম্বার বলা হতো। এই ৮০ হাজার বি.ডি. মেম্বার দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচিত করতেন।

নির্বাচকমন্ডলী: মৌলিক গণতন্ত্রে ৮০ হাজার যে বি.ডি. মেম্বার ছিল তারাই ছিলেন দেশের মূল নির্বাচকমন্ডলী। জনগণের একমাত্র বি.ডি মেম্বার নির্বাচন করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার ছিল না বিধায় এদেরকে প্রকৃত নির্বাচক বলা যায় না। বি.ডি. মেম্বারগণ সংখ্যায় তারা যত নগণ্যই হন না কেন তারাই ছিলেন প্রকৃত নির্বাচক। এদের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতি, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়।

গ. মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সামারিক শাসনের আওতায় বেশ কিছুদিন দেশ শাসনের পর মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়। এরা আইয়ুবের শাসনকে বৈধতা দেবার জন্য মোট দু'বার তাঁকে ভোট দান করেন।

১. **১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট:** দু'বছর সামারিক শাসনের পর আইয়ুব তাঁর সরকারকে এক বেসামরিক রূপ দিতে উদ্যোগী হন। এজন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল নির্বাচনের। সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা আছে কিনা সে বিষয়ে হ্যাঁ/না নির্বাচন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না। ছিল শুধু দু'টি বাক্স। একটি 'হ্যাঁ' বাক্স এবং অন্যটি 'না' বাক্স। প্রেসিডেন্টের ওপর আস্থা আছে কিনা সেটি জানাতে বি.ডি. মেম্বারগণ হ্যাঁ বা না বাক্সে তাদের ভোট দিয়েছেন। তবে ব্যালটে সীল মারার কোন বিধান ছিল না। সুতরাং পূর্বেই যেমন অনুমান করা গিয়েছিল তেমনভাবেই আইয়ুব খান শতকরা প্রায় ৯৫টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য।

২. **১৯৬২ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন:** ১৯৬০ সালে গঠিত শাসনতন্ত্র কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ ও ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্ররা শেষপর্যন্ত এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে।

৩. **১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন:** হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর ক্ষমতা ভোগ করার পর ১৯৬৫ সালে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে আইয়ুব খানের। '৬৫ সালের নির্বাচন আইয়ুব খানের '৬০ সালের মত সহজ হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ এ নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের বা সংক্ষেপে কপের প্রার্থী হিসাবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণার মুখে আইয়ুব খান অনেকটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। শেষপর্যন্ত তিনি জয়লাভ করেন তবে পূর্ববঙ্গে ফাতেমা জিন্নাহ ভালো ভোট পেয়েছিলেন।

ঘ. মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তসমূহ

মৌলিক গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কোন গণতন্ত্র ছিল না। বরং এটি ছিল অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক কৌশল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা সংহত করে আইয়ুব খান দেশের বিরোধী নেতা-কর্মীদের জব্দ করার পথ ধরেন।

১. **পোডো এবং এবডো:** পোডো (PODO, Public Office Disqualification Order) এবং এবডো (EBDO, Elective Bodies Disqualification Order) দেশের বিরোধী রাজনীতিবিদদের জব্দ এবং হয়রানি করার জন্য দু'টি নির্বতনমূলক আইন আইয়ুব সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয় এবং সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনজীবীর সহায়তা পেতেন না। বিচারের মাধ্যমে শাস্তি হিসাবে রাজনৈতিক নেতা বা নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদের জন্য রাজনীতিতে, সরকারি পদের জন্য বা এমন অন্যকোন কাজের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হতো। শুধু এবডো আইনের মাধ্যমেই প্রায় ৮৭৭ জন রাজনীতিবিদ অযোগ্য ঘোষিত হন। তাঁদের মধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম।

২. **নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার ও হয়রানি:** সামরিক শাসন জারি হবার পর রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার এবং হয়রানি একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দেশে মৌলিক গণতন্ত্রের মত একটি ব্যবস্থা চালু হবার পরও এই অবস্থা বহাল ছিল। বিরোধী রাজনীতিবিদরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে। কিন্তু ১৯৬২ সালের ভেতরই সোহরাওয়ার্দীসহ দেশের প্রধান প্রধান নেতাদের গ্রেফতার ও হয়রানির মাধ্যমে সরকার এসব উদ্যোগের জবাব দেন।

৩. **১৯৬২ সালের সংবিধান এবং স্বৈরতন্ত্র:** ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানকে একটি উদ্ভট সংবিধান উপহার দেন। এর মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের সংসদীয় ধাঁচের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে এক কমিশন গঠিত হয়। কমিশন সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা দেন। তবে শেষপর্যন্ত ১৯৬২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয় সেটি আইয়ুবের সংবিধান নামে পরিচিত। এই সংবিধানটি প্রণয়ন করাই হয়েছিল আইয়ুবের স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্য। এর ভেতর ধর্মকে এনে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করে গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র পাকাপোক্ত করার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

ঙ. ফলাফল

আইয়ুব প্রায় দশ বছর ধরে দেশ শাসন করেছিলেন।এই দশ বছরের বেশিরভাগ সময় দেশ শাসিত হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায়।মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে পাকিস্তানের জন্য কোন শুভ ফল বয়ে আনেনি, এটি পরবর্তী ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে অভিজাততন্ত্রের

সূচনা হয় তা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং পরিবেশের পথ বন্ধ করে দেয়। সমাজে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীর সৃষ্টি হয়। এতে করে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। পরিণতিতে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। আইয়ুবের সামরিক শাসনের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যেই সামরিক শাসন সম্পর্কে যে মোহ ছিল মৌলিক গণতন্ত্রসহ বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সেই মোহভঙ্গ হয়। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ক্রমে প্রসার লাভ করে। ছাত্রদের এই আন্দোলন ১৯৬২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপদস্থ এবং আইয়ুবের ঢাকা আগমন বিরোধী বিক্ষোভে প্রসার লাভ করে। এসময় সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোও সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আযম খানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় মতানৈক্য দেখা দিলে বাঙালি দরদী নামে পরিচিত আযম খান পদত্যাগ করেন। তবে ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত নির্দলীয় সদস্যরা আইয়ুব খানের প্রবল চাপ ও প্রলোভনের পরও সরকারি দলে যোগ দিতে প্রথম ইতস্তত করেছেন। অবশ্য পাকিস্তানের সেই অকর্মণ্য সংসদও শেষপর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুকূলে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬২ সালেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যাত হয়। ছাত্র আন্দোলন দমনে আইয়ুব গঠন করেন তার নিজস্ব পেটোয়া বাহিনী এন. এস. এফ.। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও চরম স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখা দেয়। এর পরিণতিতে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করেন যা বাঙালি জাতির মুক্তির দাবিতে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষ মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্ভুত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন এতই বিস্তার লাভ করে যে আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভিত নড়ে যায় এবং ১৯৬৯ সালে তাঁর পতন ঘটে।

সারসংক্ষেপ

আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতার ভিত পোক্ত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্র নামক যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন সেটি দেশের জন্য স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়েছে। এবং একই সঙ্গে তাঁর পতনেরও কারণে পরিণত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী শাসক ইয়াহিয়া খান তাই এই ব্যবস্থা বাতিল করে জনগণের সরাসরি ভোটে জনপ্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থাও করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ২য় খন্ড, ঢাকা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩।

২। সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৩। মুহাম্মদ আইয়ুব খান, *প্রভু নয় বন্ধু*, ঢাকা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৌলিক গণতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯৫৯ সালের-
(ক) ২৫ আগস্ট (খ) ২৬ আগস্ট
(গ) ২৬ অক্টোবর (ঘ) ২৭ অক্টোবর

২। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পাকিস্তানের দু'অংশে বি.ডি. মেম্বারের সংখ্যা ছিল-
(ক) ৪০ হাজার (খ) ৬০ হাজার
(গ) ৭০ হাজার (ঘ) ৮০ হাজার

৩। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় হ্যাঁ/না ভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের-
(ক) ১৪ জানুয়ারি (খ) ১৪ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১৪ মার্চ (ঘ) ১৪ এপ্রিল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কি ছিল লিখুন।
২। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বর্ণনা দিন।
৩। মৌলিক গণতন্ত্রের ফলাফল লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

পাঠ-২

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বা বিকাশ পর্যালোচনা করতে পারবেন এবং*
- *এই আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার জনসাধারণের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলনে এ অঞ্চলের ছাত্র ও যুব সমাজের ব্যাপক অবদান রয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পরপরই এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অঙ্গ দল হিসেবে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের পর ১৯৬২ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এসব ছাত্র সংগঠন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাষট্টি সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন সাধারণভাবে "শিক্ষা আন্দোলন" হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। '৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে তা ধাপে ধাপে স্বাধীনতা পর্যন্ত বিকশিত হয়।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন বা ছাত্র আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমসাময়িক শিক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে (১) শিক্ষা (২) রাজনৈতিক- এ দু'ভাগে আলোচনা করা যায়।

১. শিক্ষা প্রেক্ষাপট: ১৯৬২ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শিক্ষা আন্দোলন নামে খ্যাত। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি এ অঞ্চলের ছাত্র সমাজকে সরকার বিরোধী-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা ছিল পূর্ববাংলায় শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করতে পারলে এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ স্তিমিত হবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। তাই শুরু থেকেই সরকার পূর্ববাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য নীতি অনুসরণ করতে থাকে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই বৈষম্যের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। যেমন– ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় প্রাথমিক স্কুল, ঐ সমস্ত স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থীর হার ছিল যথাক্রমে রাষ্ট্রের মোট সংখ্যার যথাক্রমে ৭৭.৮৯%, ৮০.৯৩%, ৭৮.৯৭%। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে এসে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮.৯৩%, ৫৭.৬৮% ও ৬৩.৫৪%। তেমনি মাধ্যমিক স্তরে ১৯৪৭-৪৮ সালে স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হার ছিল যথাক্রমে ৫৭.২৬%, ৫৬.৩৮% ও ৫০.৪৭%। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৮.৫০%, ৩৯.৫৪% এবং ৩৭.৫৫%। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে

পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অনগ্রসরতার চিত্রও সমভাবে হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে একটি ও দু'টি। ১৯৬১-৬২ সালে দু' অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪টি ও ৬টি। অথচ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬২০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ৬৫৪ জন। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭১৪০ জন ও ৯৪৬৪ জন। পূর্ববাংলায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

পূর্ববাংলায় শিক্ষিতের হার সংকুচিত রাখার কৌশল হিসেবে সরকার বার্ষিক বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখার ক্ষেত্রে বৈষম্য নীতি অনুসরণ করে। নিম্নের সারণি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
অর্থ বছর	**মোট বাজেট**	**শিক্ষাখাতে বরাদ্দ**	**মোট বাজেট**	**শিক্ষাখাতে বরাদ্দ**
১৯৪৮-৪৯	১৬১.১ কোটি	১৯.৪ কোটি	২৭৯.৫ কোটি	৩৫.৪ কোটি
১৯৫১-৫২	২০১.৬ কোটি	২১.৫ কোটি	৪১১.৫ কোটি	৪৯.২ কোটি
১৯৫৬-৫৭	৩০৩.৮ কোটি	২২.৫ কোটি	৬১৩.১ কোটি	১০০.৬ কোটি
১৯৬০-৬১	৪৮৯.৫ কোটি	৬১.৯ কোটি	৮৪৭.২ কোটি	১২১.৬ কোটি
১৯৬২-৬৩	৭৪৫.২ কোটি	৭৬.৫ কোটি	১৩৪৯.৩ কোটি	২০৩.৪ কোটি

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত শিক্ষাখাতে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণের পরও সরকার ১৯৬২ সালের শেষদিকে পাকিস্তানের যে নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করে তাতে পূর্ববাংলার শিক্ষার নিম্নগতিকে আরো ত্বরান্বিত করার কৌশল অনুসরণ করা হয়। ফলে এ অঞ্চলের সচেতন ছাত্র সমাজ তথা ছাত্র সংগঠন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

২. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরপরই পূর্ববাংলায় কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিদেশী শোষণের অবসান প্রভৃতি ছিল এ সংগঠনের লক্ষ। কিন্তু সরকারি দমননীতি ও নির্যাতনের মুখে ১৯৪৮ সালেই এ সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে গঠিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হল পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে এ সংগঠনটি গঠিত হয়। পরের বছর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে ছাত্র সংগঠনটি মূলত আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করতে থাকে। ১৯৫৫ সালের পর দু'টি সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

সমসাময়িককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। তবে সরকারের কঠোর দমননীতির মুখে খুব শীঘ্রই দলটির বিলুপ্তি ঘটে। ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্টরা 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর অনুকরণে 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয় এবং পাশাপাশি এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে 'ছাত্র ইউনিয়ন' গঠিত

হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ববাংলার গণমানুষের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে 'ছাত্রলীগ' ও 'ছাত্র ইউনিয়ন' যুগপৎ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে ১৯৫২ সালে ভাষার দাবি নিয়ে পূর্ববাংলায় সরকার বিরোধী যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিল এ অঞ্চলের ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্র সমাজ। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ পূর্ববাংলার যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ফলাফলের ওপর।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত নামমাত্র গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও ১৯৫৮ সালে তারও অবসান ঘটে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি সরকারি মহলকে গণতন্ত্রের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া '৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদের যে ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয়, ক্ষমতাসীন দল তাতে ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে তা নস্যাৎ করার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়। তাই জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ড় এ ঘোষণা বহাল থাকে। এ সময়ের মধ্যে পূর্ববাংলার সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়। ফলে উল্লেখিত সময়ে পূর্ববাংলায় যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণের লক্ষে এগিয়ে আসে এ অঞ্চলের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো তথা ছাত্র সমাজ। সামরিক সরকার ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর কড়া নজর রাখলেও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে এবং ১৯৬২ সালে সরাসরি সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।

আন্দোলনের পর্যায়

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের পরোক্ষ প্রস্তুতি চলতে থাকে '৬১ সালের গোড়ার দিকে ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে। এ পর্বে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। এ দু' ছাত্র সংগঠন ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ও রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং এ উপলক্ষে চারদিন ব্যাপী কর্মসূচি গৃহীত হয়।

এদিকে সামরিক সরকার ছাত্র সংগঠনগুলোর গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করে এবং এদের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর আজম খান ছাত্র রাজনীতিকে 'শয়তানের মনন' বলে আখ্যায়িত করেন। রাজনীতিতে জড়িত ছাত্রদের তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কখনো 'নক আউট' আবার কখনো 'কিক আউট' করার ঘোষণা দেন। আবার কেন্দ্রীয় সরকার গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ঘোষণা করে। যেমন– রাজনীতির সাথে জড়িত মেধাবী ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরি, সশস্ত্র বাহিনীতে কমিশন লাভ এবং আন্তর্জাতিক বৃত্তি লাভে অযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়। সরকারের এ ধরনের ঘোষণায় ছাত্র সমাজ ভীত না হয়ে বরং সরকারবিরোধী কঠোর আন্দোলনের লক্ষে এগিয়ে যায়। এ অবস্থায় ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের লক্ষে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ইস্কাটনের একটি বাড়িতে এক গোপন সভায় মিলিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে কোন কিছুর বিনিময়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং পরবর্তী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকেই তা শুরু করা হবে। কিন্তু এর আগেই ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের খবর ৩১ জানুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দাবানলের মত চারদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা–

প্রথম পর্ব : সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

দ্বিতীয় পর্ব : সংবিধান বিরোধী আন্দোলন

তৃতীয় পর্ব : আইয়ুব প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন।

প্রথম পর্ব : সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা আতাউর রহমানের বাসভবনে সরকার বিরোধী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী করাচি গেলে তাঁকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদ পরদিন পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ অঞ্চলের ছাত্র সমাজ সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং এর মধ্যদিয়ে আন্দোলনের প্রথম পর্বের সূচনা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে মধুর ক্যান্টিনে বৈঠকে মিলিত হয় এবং পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বক ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সংবাদ পত্রিকায় ছাপানো না হওয়ায় ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবে যায় এবং সরকারি পত্রিকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ৩ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে আসলে ছাত্ররা তাকে নাজেহাল করে। ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার দেয়ালগুলো সামরিক সরকারবিরোধী লেখায় ভরে যায়।

৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিছিল বের করে এবং উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশের বাস পুড়িয়ে দেয়। ৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী স্বয়ং আইয়ুব খানকেই ঘেরাও করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। ফলে ৭–৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চলতে থাকে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রায় ২২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। মার্চ মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুললে আবার আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ মার্চ থেকে অব্যাহতভাবে ধর্মঘট চলতে থাকে। এ সময় ডাকসুর সহ-সভাপতি রফিকুল হক ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হায়দার আকবর খান প্রমুখ নেতাসহ বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করা হয়।

দ্বিতীয় পর্ব : শাসনতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ঘটে আইয়ুব খান কর্তৃক পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্র করে। আইয়ুব খান ১৯৬০ সলের জানুয়ারি মাসে মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৫.৬ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এর দুদিন পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (BNR) নামক একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন '৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করে। কমিশন আইয়ুব খানের সাংবিধানিক পরিকল্পনা সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে ব্রিটিশ পদ্ধতির পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র পাকিস্তানে প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়,

পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা পাকিস্তানে চালু করলে অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক নেতাদের আত্ম স্বার্থপরতা এবং দুর্নীতির জন্ম দিবে। অতএব, রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণার্থে প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের কথা বলা হয় এবং ভোটারদের যোগ্যতা হিসেবে শিক্ষা ও সম্পদের বিধান রাখা হয়।

আইয়ুব খানের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচন ঘোষিত হলে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ পুনরায় আন্দোলনের ডাক দেয়। ছাত্রদের নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। নির্বাচন শেষে আন্দোলনরত ছাত্ররা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নিকট বিবৃতির মাধ্যমে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করে। এরমধ্যে প্রধান দাবিগুলো ছিল– সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তিদান, গ্রেফতারি পরওয়ানা প্রত্যাহার, সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্মী ও বন্দিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আরোপিত EBDO ও PODO প্রভৃতি কালাকানুনের প্রত্যাহার, বাক-স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রদানসহ ছাত্রদের স্বার্থ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু দাবি। ছাত্রদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভায় সরকারবিরোধী গ্রুপ নিজেদের জন্য ৮ দফা নীতিমালা গ্রহণ করে। এগুলো হলো মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনা বিচারে ডিটেনশনের বিরোধিতা, সকল রাজনৈতিক বন্দির আশু মুক্তি ইত্যাদি। ২৫ জুন (১৯৬২) পাকিস্তানের নয়জন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেন। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকেও ছাত্রদের দাবির পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। ফলে সরকার অধিকাংশ ছাত্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

নির্বাচন শেষে নেতৃবৃন্দ অন্য একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে পার্লামেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা বলার প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ টার্গেট ছিল মোনায়েম খান। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েই তিনি ময়মনসিংহ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে রাজবন্দিদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের মুক্তি না দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। এর প্রতিবাদে ছাত্র সংসদ অধিবেশনের দিন বিমান বন্দরে মোনায়েম খানকে নাজেহাল করে। মোনায়েম খান কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং দু'মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে ছাত্রদের ওপর ব্যাপক দমন নীতি চালিয়ে এর প্রতিশোধ নেন।

তৃতীয় পর্ব ঃ শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন

আগস্ট মাস থেকে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে সমসাময়িক শরীফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টকে কেন্দ্র করে। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ১৯৫৮ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করেন এবং পাকিস্তানের পরবর্তী শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কমিশনের রিপোর্ট সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ১৯৬২ সালে তা প্রকাশিত হয়। কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানে ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক, উর্দুকে সার্বজনীন ভাষায় রূপান্তর, উর্দু ও বাংলা ভাষার সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কমিশন পাকিস্তানের একটি অভিন্ন বর্ণমালার জন্য সুপারিশ করে এবং অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবান্তর বলে ঘোষণা করে।

শরীফ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের শিক্ষা বিষয়ক কতগুলো সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে। যথা–

১. প্রতিটি স্কুলে ৬০ শতাংশ ব্যয় সংগৃহীত হবে ছাত্রদের বেতন থেকে বাকি ২০ শতাংশ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্বাহ করবে।

২. পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের সময়গত পার্থক্য বিলোপ করা হয়।

শরীফ কমিশনের সুপারিশ ও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ছাত্ররা তৃতীয়বারের মত আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ঢাকা কলেজ থেকে প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের মেডিকেল, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আন্দোলনের ডাক দেয়। ১০ আগস্ট ঢাকা কলেজের ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়ে ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী ধর্মঘট এবং ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়। ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয় এবং এদিন থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১০ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেওয়া হয়। এদিকে ১০ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি প্রদান করে সরকার তাঁর মুক্তিপ্রদান সম্পর্কে কটাক্ষ করলে ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং শুরু করে। ঐদিন ছাত্রদের সঙ্গে পূর্ববাংলার ব্যবসায়ী সমিতি, কর্মচারী সমিতি, রিকশা ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন যোগ দেয়। সরকার আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী নির্যাতনে কয়েকজন ছাত্র নিহত ও আহত হয়। এদিন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে যশোর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের নির্যাতনে বহু ছাত্র আহত ও গ্রেফতার হয়। তিনদিন পূর্ববাংলায় ব্যাপক ছাত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ঘটনার ক্রম অবনতি লক্ষ করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরই পরামর্শে ছাত্র অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনের মধ্যে সরকার শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে। একই সঙ্গে এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালের জন্য যে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষার্থী ছিল তাদের পরীক্ষা ব্যতীত ডিগ্রি প্রদান করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যদিয়ে ছাত্র আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব

পূর্ববাংলার ছাত্র আন্দোলন তথা জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, ১৯৬২ সালের আন্দোলন ছাত্র সমাজ ও ছাত্র সংগঠনসমূহের জন্য অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেয়। শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যাপক ও বিশাল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পরে তা ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। আর ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনে এ বীজ অংকুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সঙ্গে প্রগতিশীল ধারার স্ফূরণ ঘটায়। সমগ্র দেশে এ আন্দোলন অসামান্যস্পর্শী প্রাণের জোয়ার বয়ে আনে।

তৃতীয়ত, এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বলা যায় যে, আইয়ুব খানের মত লৌহ মানব ছাত্র আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তিদান ও ১৯৬২ সালের শেষ দিকে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করতে বাধ্য হন।

চতুর্থত, আইয়ুব খান ক্রমবর্ধমান ছাত্র আন্দোলনের বা ছাত্রদের রোষানল থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষে বিনা পরীক্ষায় ছাত্রদের ডিগ্রি প্রদান করেন।

পঞ্চমত, 'শিক্ষা আন্দোলন' হিসেবে বহুল পরিচিত এ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকও উপেক্ষনীয় নয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে যে দমন-পীড়ন ও বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ও রাজনীতিবিদদের অকেজো করার জন্য বিভিন্ন অযোগ্যকরণ অধ্যাদেশ জারি করেন তাতে পাকিস্তানে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে এক চরম রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। '৬২-র আন্দোলন এ পরিকল্পিত রাজনৈতিক শূন্যতাকে ভেঙ্গে গোটা পরিবেশকে চাঙ্গা করে তোলে।

ষষ্ঠত, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন '৬৯-এর ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের পতন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি রাজনৈতিক এলিটদের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা। পঞ্চাশের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন এবং ষাটের দশকের শেষ নাগাদ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়ক হিসেবে ১৯৬২ সালের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সর্বশেষে, ১৯৬২ সালের আন্দোলনে এবং তার পূর্বে ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সাল একটি মাইল ফলক। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, শাসনতন্ত্র ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ১৯৬২ সালের আন্দোলন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সরাসরি প্রয়োগ ঘটিয়ে ছাত্র সমাজ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতন ঘটায় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। তাই শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
২। আবুল কাশেম, 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ঃ প্রকৃতি ও পরিধি', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-১৪০৪।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল–

(ক) ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৭টি।

২। পূর্ব পাকিস্তানে তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা ছিল–

(ক) ৭১৪০ জন (খ) ৭২৪০ জন

(গ) ৯৪৬৪ জন (ঘ) ৭০০০ জন।

৩। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলায় গঠিত নতুন ছাত্র সংগঠনের নাম–

(ক) ছাত্র ফেডারেশন (খ) পুর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

(গ) ছাত্র ইউনিয়ন (ঘ) পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ।

৪। ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে কমিশন গঠন করেন তার নাম–

(ক) শরীফ কমিশন (খ) হামুদুর রহমান কমিশন

(গ) ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (ঘ) মোমিন কমিশন।

৫। শরীফ কমিশনের প্রধান এস.এম. শরীফ ছিলেন একজন–

(ক) শিক্ষক (খ) বিচারপতি

(গ) রাজনীতিবিদ (ঘ) সচিব।

৬। শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রথম শুরু হয়–

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খ) ঢাকা কলেজে

(গ) করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঘ) জগন্নাথ কলেজে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি সংক্ষেপে লিখুন।

২। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রস্তুতি আলোচনা করুন।

৩। শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। এ আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল?

পাঠ-৩

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *যুদ্ধের ঘটনাবলী জানতে পারবেন;*
- *পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *১৯৬৬ সালের উত্থাপিত ৬ দফার পেছনে যুদ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *আইয়ুব খানের পতনে এর প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।*

দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র দু'টির সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকেই শুরু হয় পরস্পরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। রাষ্ট্র দু'টির মধ্যকার এ প্রতিযোগিতা বহুবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার বৈরী সম্পর্কের প্রধান লক্ষ কাশ্মিরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৪৭ সালে। শেষপর্যন্ত জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে। এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এর প্রভাব বা ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক. যুদ্ধের কারণ

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মূল কারণ ছিল পাকিস্তান কর্তৃক ভারত শাসিত কাশ্মির অধিকার ও পাকিস্তান শাসনভুক্ত করার প্রচেষ্টা। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মিরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু ও কাশ্মির) এবং পাকিস্তান এক-তৃতীয়াংশ দখল করে। যদিও ভারত দাবি করে যে কাশ্মিরের মহারাজা হরি সিং-এর সাথে একটি চুক্তির মাধ্যমে আইনগতভাবে কাশ্মির-এর ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পাকিস্তান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে সমগ্র কাশ্মিরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মিরে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। বস্তুতপক্ষে, তখন থেকেই পাকিস্তানের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত হয়। ১৯৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান এ বিষয়ে অনেকটা নীরব থাকলেও ১৯৬৫ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পুনরায় ভারত বিরোধী রাজনীতিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং ভারত অধিকৃত কাশ্মিরের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে উজ্জীবিত হন। কতগুলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা আইয়ুব খানকে ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করেছিলো। কারণগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হলো–

১. আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা: আইয়ুব খান মনেপ্রাণে একজন দাম্ভিক লোক ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি পাকিস্তানে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। এ সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে তিনি নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে তোলেন। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের মুখে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন এবং শেষপর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তিসহ শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা বাতিল করেন। এতে তাঁর ভাবমূর্তি অনেকটা খর্ব হয়। এরপরই আইয়ুব বিরোধী ৯ দলীয় ফ্রন্ট 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এনডিএফ) গঠন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আন্দোলনে আইয়ুবের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুন্ন হয়। এই ফ্রন্টের কার্যক্রম স্তিমিত করতে ফ্রন্টের কার্যক্রমের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৬৪ সালে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বিহারি-বাঙালি দাঙ্গায় রূপান্তরিত হতে সময় লাগেনি। দাঙ্গা বিদ্বেষী বাঙালিদের তৎপরতায় সরকার শঙ্কিত হয়। এর সাথে যুক্ত হয় ১৯৬৫ সালের নির্বাচনের ফলাফল। নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে আইয়ুব জয়ী হন। কিন্তু বিরোধী দলীয় 'কপ' প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ ভোটে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকারি প্রার্থীকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই রাজনীতিবিদরা আইয়ুব-বিরোধী কঠোর কর্মসূচি দেয়ার চেষ্টা চালান। অন্যদিকে আইয়ুব খান তাঁর ব্যর্থতা ঢাকার জন্য জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশে কাশ্মির জয় করে পাকিস্তানের জন্য বড় ধরনের কৃতিত্ব বয়ে আনতে সচেষ্ট হন।

২. চীন-ভারত যুদ্ধের প্রভাব: ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী পরাজিত হয় এবং চীন ভারত শাসিত কাশ্মিরের 'আকসাই' অঞ্চল দখল করে নেয়। চীনের কাছে ভারতীয় বাহিনীর পরাজয় পাকিস্তানকে উৎসাহিত করে। আইয়ুব খান হঠাৎ করে তাঁর ভারত নীতি পরিবর্তন করে পূর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন।

৩. আন্তর্জাতিক প্রভাব: চীন-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান চীনের সাথে মৈত্রী জোট গড়ে তোলে। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথেও আইয়ুব খানের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। নির্বাচনের পরপর তিনি পিকিং ও মস্কো সফর করেন। এসব রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার আশ্বাস পেয়ে আইয়ুব খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

৪. কাশ্মিরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা: ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাশ্মিরের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মিরের যে বিশেষ স্থান ছিল ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে শাস্ত্রীর সরকার সংবিধান সংশোধন করে তা তুলে দিয়ে কাশ্মিরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করে নেয়। এর ফলে পাকিস্তানে নতুন করে ভারত বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

৫. কচ্ছের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিজয়: ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী কচ্ছের রানের উত্তরাংশ পাকিস্তান দাবি করলে ভারত তার সম্পূর্ণটাই নিজের বলে ঘোষণা করে। এ দাবি নিয়ে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং এ সংঘর্ষে পাকিস্তানই বেশি সফলতা অর্জন করে। এ যুদ্ধে বিজয় আইয়ুব খানের মনোবল ও আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

৬. পাকিস্তানের গৌরব ও আয়তন বৃদ্ধি: চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয়, কচ্ছের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিজয় এবং পাকিস্তানের বিশাল সৈন্যবাহিনী আইয়ুব খানের মনোবল বৃদ্ধি করে। তাই তিনি ভারত অধিকৃত কাশ্মির অধিকারের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি ও গৌরব বাড়ানোর লক্ষে অগ্রসর হন। আর এ নীতির প্রত্যক্ষ পরিণতি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ।

৭. পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য নস্যাৎ করা: পাকিস্তান রাষ্ট্রে জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। এরপর সংখ্যাধিক্যের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে। আইয়ুব খান চেয়েছিলেন কাশ্মির অধিকার করে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য নষ্ট হবে। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে আইয়ুব খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

৮. পাকিস্তানের সমসাময়িক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের প্রভাব: পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেড.এ. ভুট্টো এবং পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমদ পাকিস্তানের সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান আইয়ুব খানকে ভুল পথে প্রভাবিত করেছেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পেছনে তাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো।

খ. যুদ্ধের ঘটনাবলি

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কারণ যাই থাকুক না কেন, পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ ছিল যুদ্ধে ভারতকে পদানত করে ভারত শাসিত কাশ্মির অধিকার করা এবং তা পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত করা। এ লক্ষ সামনে নিয়ে পাকিস্তান অগ্রসর হয়। কাশ্মিরী নেতা শেখ আব্দুল্লাহ্‌র গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পাকিস্তান ভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। ভুট্টোর পরিকল্পনা মোতাবেক কাশ্মিরে সশস্ত্র গেরিলা অনুপ্রবেশ ঘটানো শুরু হয় ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে। ৯ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মির বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় ভারত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে দেয়। ব্যাপক গুলি, অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ চলতে থাকলে পাকিস্তানি প্রচারযন্ত্রে একে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মিরী জনগণের বিদ্রোহ বলে প্রচার করতে থাকে। সমস্ত আগস্ট মাস ধরে পাক সেনারা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর আক্রমণ চালাতে থাকে। অবশেষে ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাশ্মিরের ভারতীয় অংশ আক্রমণ করলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য বজায় রাখতে শুরু করে। ভারতীয় সৈন্যরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোর শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাকিস্তানিরা কাশ্মির সীমান্তের ছামর সেক্টরে সাফল্য লাভ করলেও অন্যত্র পরাজিত হতে থাকে।

পাকিস্তানের এহেন চরম দুর্দিনে পূর্ব পাকিস্তানিরাই চরম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে লাহোর শহর রক্ষা করেছিল। এদিকে যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থা অনুভব করতে পেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্য শক্তি উভয়েই যুদ্ধ বন্ধ করতে আগ্রহী হয়। তাদের যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘের কঠোর হুশিয়ারীর ভিত্তিতে মাত্র সতের দিনের মাথায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধ করা হয়। এর কয়েক মাস পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু এ চুক্তির নয়টি ধারার কোনটিতেই কাশ্মির সমস্যার উল্লেখ মাত্র ছিল না।

গ. পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানেও পাক-ভারত যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মহলগুলো তাসখন্দ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেন। বস্তুতপক্ষে এ অঞ্চলের মানুষ পাক-ভারত যুদ্ধকে আইয়ুব খানের হঠকারিতা বলে আখ্যা দিয়েছিল। পাক-ভারত যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর কারণ হচ্ছে যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। ভারত ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানি জওয়ানরা জীবন বাজি রেখে পাঞ্জাবের লাহোর শহর রক্ষা করলেও পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ন্যূনতম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তাছাড়া যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানসহ গোটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরতাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অসহায়ত্ব সকল বাঙালির চোখে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। একই সাথে ইসলামের নামে ও সাম্প্রদায়িক আবরণে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যুদ্ধের সময় থেকে নগ্ন আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দু' ছিলেন বলে তাঁর গান পাকিস্তানি বেতারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নজরুল ইসলামকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পরও তাঁর ইসলামী গানগুলো থেকে 'হিন্দুয়ানি' শব্দসমূহ বাদ দিয়ে পরিবেশন করা হতে থাকে। এভাবে বিষয়টি এমনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ বাহ্যত ভারতের বিরুদ্ধে হলেও যুগপৎ তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। পরবর্তী প্রেক্ষাপট দৃষ্টে মনে হয় আইয়ুব খান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে কাশ্মিরের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' জয়ের নেশায় মত্ত হলেন।

ঘ. ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে পাক-ভারত যুদ্ধের (১৯৬৫) প্রভাব

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাজ করেছিল। ছয় দফা দাবির মূল ইস্যু পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য হলেও ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে নিরাপত্তাহীনতায় রাখা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা প্রভৃতি কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এজন্য ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ এ অঞ্চলের স্থানীয় নিরাপত্তার জন্য একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠনের দাবি জানানো হয়। এই দাবিগুলো বাঙালির প্রাণের দাবিতে পরিণত হতে সময় লাগেনি। জি. ডব্লিউ. চৌধুরীর মতে, এই যুদ্ধ এক অখন্ড পাকিস্তান ধারণার প্রতি সর্বশেষ আঘাতস্বরূপ ছিল।

ঙ. ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন থেকে গণআন্দোলন ও আইয়ুব খানের পতন

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলে সদ্য পাক-ভারত যুদ্ধে পরাজিত আইয়ুব খানের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। ফলে আইয়ুব কাশ্মির বিজয়ের ব্যর্থতার ক্ষোভ কড়ায়-গন্ডায় বাঙালির ওপর আদায় করতে উদ্যত হন এবং আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে বাঙালি নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ১৯৬৮ সালে দেশব্যাপী 'উন্নয়নের এক দশক' নামে আইয়ুব খানের শাসনের এক ব্যাপক প্রচারণা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দু'অঞ্চলের ব্যাপক বৈষম্য এবং ব্যবধানের যে চিত্র দেখতে পায় তার ফলে তাদের মধ্যে

তীব্র ক্রোধ সৃষ্টি হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলে এবং এ আন্দোলনে অবশেষে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

সারসংক্ষেপ

১৯৬৫ সালে ভারতকে পরাজিত করে কাশ্মির বিজয় সংক্রান্ত আইয়ুব খানের পরিকল্পনা ছিল একটি অলীক স্বপ্ন। বস্তুতপক্ষে আইয়ুব নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশের লক্ষে প্রতিপক্ষকে বিবেচনা না করে এ যুদ্ধে লিপ্ত হন। আর এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিজ দেশসহ বহির্বিশ্বেও নিন্দিত হয়েছেন। অপরপক্ষে, পাক-ভারত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ন হন। অবস্থা এমনই প্রমাণিত হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের কারণে আইয়ুব খান পরাজিত হয়েছেন। এটা ছিল আইয়ুব খানের একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাঁর এরূপ বৈরিভাব এ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরো যুক্তিযুক্ত করে তোলে এবং শেষপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তাই বলা যায়, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পরোক্ষভাবে আইয়ুব খানের পতনকে সুনিশ্চিত করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। জি.ডব্লিউ. চৌধুরী, *অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১।
২। কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ স্থায়ী হয়–
(ক) ১৩ দিন (খ) ১৭ দিন
(গ) ২১ দিন (ঘ) ২৭ দিন।

২। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান ঘটে যে চুক্তির মাধ্যমে তার নাম–
(ক) সিমলা চুক্তি (খ) দিল্লি চুক্তি
(গ) তাসখন্দ চুক্তি (ঘ) লাহোর চুক্তি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ঘটনাবলি লিখুন।
২। পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের পতনের জন্য তাসখন্দ চুক্তি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল লিখুন।
৩। ৬ দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে এই যুদ্ধের কি কোন প্রভাব ছিল?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কারণগুলো বর্ণনা করুন।

২। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ঘটনাবলি আলোচনা করুন। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত ৬ দফা প্রণয়ন সহ পূর্ববঙ্গে এই যুদ্ধের প্রভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৪

ছয় দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

৬ দফার পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;
৬ দফার রূপরেখা বর্ণনা করতে পারবেন;
৬ দফার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন;
৬ দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে অবগত হবেন;
৬ দফার গুরুত্ব জানতে পারবেন;
৬ দফা পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল কিনা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলন চলাকালে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের পূর্ববর্তী আঠার বছরের সংগ্রামের পটভূমিতে ঐ ঘোষণা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে চরম অবহেলার ফলে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরো তীব্র করে তোলে। তাসখন্দ চুক্তি ঘোষণার পর যখন পাকিস্তানি শাসকচক্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তখনই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ব্যাপকভাবে এ কর্মসূচি সমর্থন করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান যথার্থই বলেন, ৬ দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বস্তুত, ১৯৬৬ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক আন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় তথা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে উৎসাহ যুগিয়েছিল ছয় দফাভিত্তিক স্পৃহা।

ক. ছয় দফার পটভূমি

ছয় দফা দাবি উত্থাপন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাসে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বস্তুতপক্ষে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকে পূর্বাঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক মনোভাব তথা এ অঞ্চলের রাজনীতিবিদদের অবমূল্যায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি অনুসরণ, সামরিক দিক থেকে গুরুত্ব না দেওয়া প্রভৃতি ছয় দফা দাবিকে যুক্তিযুক্ত করে তুলেছিল। তাই ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পটভূমি রয়েছে।

১. রাজনৈতিক পটভূমি: ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনে

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ও গণমুখী সংবিধান প্রণয়নের কথা বলা হলেও পাকিস্তানের প্রথম সরকার গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন করতে এক দশক অতিবাহিত হয়ে যায়। তাছাড়া ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করলেও পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্ট সরকার সফল হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করেন। ১৯৫৯ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে নির্বাচনের নামে প্রহসন কায়েম করেন। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে ১৯৬৬ সাল তথা স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাই এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সকল পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত মূলত কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া হতো। এছাড়া ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দীর্ঘদিন কেন্দ্রের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সামরিক দিক থেকে পূর্বাঞ্চল একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের ছিল না। এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবি করেন।

ড. প্রীতিকুমার মিত্র এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যকার গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবোধের বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ড. প্রীতিকুমার মিত্র তাঁর 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯৪৭-এর পর থেকে পাকিস্তানে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুসারী ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এর ফলে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও অপরদিকে রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন দেশবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এরই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

২. প্রশাসনিক পটভূমি: পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত সকল স্তরে পূর্ব পাকিস্তানিদের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই নগণ্য সংখ্যক। পরিকল্পিত উপায়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের নিয়োগ করা হয়নি। পাকিস্তানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হাসান আশকারী রিজভি একটি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন আইয়ুব আমলে মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ২২জন ছিলেন বাঙালি মন্ত্রী। এই ২২ জনের মধ্যে কাউকে কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের তেমন কোন ভূমিকা থাকতো না। এজন্যই ৬ দফায় স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিত ক্ষমতা এবং আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।

৩. অর্থনৈতিক পটভূমি: পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত আয় স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমে চলে যেতো। আবার চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যাধিক্য থাকায় এ সমস্ত আয় মূলত: তারাই ভোগ করতো। ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়-ব্যয়ে দুই প্রদেশের অবদান নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ২২% এবং চলতি ব্যয়ে সে হিস্যা হল ১২%। কিন্তু এ হিসাবও যথার্থ নয়। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানিদের আমদানি ও আয়কর শুল্ক পশ্চিম পাকিস্তানে জমা দিতে হতো। আবার রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মোট আয়ের ৬০% আসে পূর্বাঞ্চল থেকে। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে পুর্ব পাকিস্তানের অবদান বেশি হলেও ভোগ ও উন্নয়ন ব্যয়ে এ অঞ্চলের লোকজন তাদের ন্যায্য অংশ পেতো

না। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈষম্য কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া হলে পূর্বাঞ্চলে মাথাপিছু ব্যয় হয়েছিল ১৯০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯২ টাকা।

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২,১৫০ কোটি টাকা। অথচ আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্বাণিজ্যে প্রথম দশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে ৪০৭.৬ কোটি টাকার ঋনাত্মক ভারসাম্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ৮৬৮ কোটি টাকা ঋনাত্মক ভারসাম্য বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এ সময় প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে।

পশ্চিমাঞ্চলের বৈদেশিক ঋণের বোঝা মেটানো হতো পূর্ব পাকিস্তানের ঋনাত্মক আয় থেকে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ নানা উপায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতো। ১৯৫৬ সালের পূর্বে প্রতি বছর জাতীয় আয়ের ২% পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে পাচার হতো। এরূপ বৈষম্য নীতি ও শোষণের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৬ দফা উত্থাপিত হয়।

৪. সামরিক পটভূমি: ৬ দফা উত্থাপনের সামরিক প্রেক্ষাপট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের অংশগ্রহণ ছিল স্বল্পসংখ্যক। সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় হচ্ছে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সামরিকভাবে প্রায় অরক্ষিত ছিল। সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ প্রতিহত করার মতো কোন শক্তি পূর্বাঞ্চলের ছিল না। তাই ৬ দফায় আঞ্চলিক আধাসামরিক বাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়।

এরূপ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি প্রণয়ন করেন এবং ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্সে উত্থাপনের চেষ্টা করেন। ঐদিন ৬ দফা দাবি উত্থাপনে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ৬ দফা প্রচার করেন এবং দেশে ফিরে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা উত্থাপিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা গৃহীত হয়।

খ. ছয় দফার রূপরেখা

১ম দফা ঃ **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি:** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নপূর্বক পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২য় দফা ঃ **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:** যুক্তরাষ্ট্র (কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয় অঙ্গরাজ্যসমূহের হাতে থাকবে।

৩য় দফা ঃ **মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা:** এ দফায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়–

ক. দেশের দু'অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দু'টি মুদ্রা চালু থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রার লেনদেন হিসাব রাখার জন্য দু'অঞ্চলে দু'টি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। অথবা–

খ. দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চল থেকে মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। এ ব্যবস্থায় পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু'অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪র্থ দফা ঃ **রাজস্ব, কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা:** সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। শাসনতন্ত্রে এ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বিধান থাকবে।

৫ম দফা ঃ **বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য:** বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।

৬ষ্ঠ দফা ঃ **প্রতিরক্ষা:** আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশগুলোকে নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে আধাসামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

গ. ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফা প্রকাশিত হবার পর এর প্রতি পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার ও ইসলামপন্থী বিরোধী দলগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যথা–

১. সরকারি প্রতিক্রিয়া: ছয় দফার প্রতি পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক ও কঠোর। লাহোরে ছয় দফা উত্থাপিত হবার পরদিনই পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) করাচিতে পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা বলে আখ্যা দেন। একইভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয় দফাকে 'হিন্দু আধিপত্যাধীন যুক্তবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দেন এবং ছয় দফা সমর্থকদের 'গোলযোগ সৃষ্টিকারী' আখ্যা দিয়ে তাদের উচ্ছেদকল্পে প্রয়োজনে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহারের হুমকি দেন। অপরদিকে ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন জোরদার হতে দেখে আইয়ুব খান ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারসহ বহু আন্দোলনকারীকে কারারুদ্ধ করেন।

২. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব দলই ৬ দফার সমালোচনা করে। কাউন্সিল মুসলীম লীগ একে 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি' হিসেবে চিহ্নিত করে। পিপিপি প্রধান জে.এ. ভুট্টো একে দেশ বিভাগের ফর্মুলা আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। জামায়াতে ইসলামী ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতার লক্ষে

পরিচালিত দাবি বলে আখ্যা দেয়। নেজামে ইসলামী এই কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করে শেখ মুজিবকে একনায়ক কায়দায় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সমালোচনা করেন। সকল ধর্মভিত্তিক দলের অভিন্ন বক্তব্য ছিল, ৬ দফা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে।

তবে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু। ন্যাপ (ভাসানী) অবশ্য এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিল। মওলানা ভাসানী ছয় দফাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে বর্ণনা করে একে অর্থনৈতিকভাবে অসম্পূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কোন কোন ন্যাপ নেতা একে সিআইএ'র পরিকল্পনা বলে আখ্যা দেন। ১৯৬৬ সালে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ন্যাপ ৬ দফার পাল্টা ১৪ দফা ভিত্তিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে আইয়ুবের চৈনিক নীতির কারণে ন্যাপ তাকে সমর্থন করায় স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ভাসানী পশ্চাদপদ নীতি অনুসরণ করেন।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও একটি অংশ এই কর্মসূচির সমালোচনা করেন। বিশেষ করে দলের পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। ফলে ৬দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানিরা কর্মসূচির সমর্থন ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিরোধিতা করায় আওয়ামী লীগে অঞ্চলভিত্তিক ভাঙ্গনের সূত্রপাত ঘটে। আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র একটি অংশও ৬ দফার বিরুদ্ধে ছিলেন।

ঘ. ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিকাশ

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ৬ দফা পাশ হবার পর শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করে বেড়ান এবং ছয় দফা তুলে ধরেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ৬ দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে উঠতে থাকে।

এদিকে ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলন জোরদার হতে দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং বিভিন্ন জনসভায় ৬ দফাকে ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তান ভাঙ্গার দলিল বলে আখ্যা দিতে থাকেন। সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর কটূক্তি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকলে পাকিস্তান সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতে থাকে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবসহ আরো অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ঐদিকে মিছিলে পুলিশের গুলিতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বহু লোক প্রাণ হারায়। ১৯৬৬ সালে ৭ জুনের রক্তস্নাত আন্দোলনের মধ্যদিয়েই ছয় দফার প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের তুলনাহীন সমর্থন প্রমাণিত হয়। সরকারের প্রতি জনগণের ঘৃণা তীব্রতর হয়।

৭ জুনের ঘটনার প্রতিবাদে ৮ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সভা থেকে বিরোধীদল ওয়াক আউট করে এবং একই দিন প্রাদেশিক পরিষদ থেকে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। ১৩ জুন থেকে আবার শুরু হয় গ্রেফতারি কার্যক্রম। ১৫ জুন ইত্তেফাক-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৬ জুন ইত্তেফাক, ঢাকা টাইমস ও নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। পরের বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকারের এসব হটকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ তথা আপামর জনতা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং ছয় দফাভিত্তিক বজ্রকঠোর আন্দোলন গড়ে

তোলে। সরকার ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষে ১৯৬৮ সালের শেষদিকে ছয় দফার প্রণেতা শেখ মুজিবসহ আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামক মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং তাদের গ্রেফতার করে। এরপর কিছুদিনের জন্য ছয় দফা আন্দোলন শিথিল থাকলেও ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে আবার চাঙ্গা হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ছাত্রদের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে উঠলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আবার তীব্র রূপ লাভ করে।

ঙ. ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব

পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার তথা স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয়দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর বিভিন্নমুখী গুরুত্ব নিম্নরূপ–

১. শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর: ছয়দফা ভিত্তিক দাবিগুলো ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রস্তাবের প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ছয় দফাকে 'বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

২. স্বায়ত্তশাসনের দাবি: ছয় দফার পূর্বে বাংলার পক্ষ থেকে যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো ছিল মূলত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাঙালির অধিকারের দাবি। বস্তুতপক্ষে, ছয় দফার মধ্যদিয়েই পূর্ববাংলাকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবি করা হয়েছিল।

৩. স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ: ছয় দফাভিত্তিক দাবির মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তান বস্তুতপক্ষে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। পৃথক মুদ্রা চালু ও পৃথক হিসাব রাখা এবং আঞ্চলিক মিলিশিয়া বাহিনী গঠন প্রভৃতি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় বহন করে।

৪. সর্বাত্মক আন্দালন: ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন ছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রথম সর্বাত্মক দুর্বার আন্দোলন। এ দাবিগুলোর মধ্যে আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় তারা ছয় দফাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে জাগ্রত: ছয় দফা ছিল একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসনাধীন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রথম হাতিয়ার। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৬. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: ছয় দফাভিত্তিক দাবিগুলো ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রাণের দাবি। বৈষম্যের শিকার বাঙালি জাতি এর মাধ্যমে দিক নির্দেশনা পায়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম দাবিগুলো পাকিস্তান সরকারের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এতোদিনের বিক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে অগ্রসর হয় প্রফেসর রওনক জাহানের ভাষায়, "Sixpoint movement whose main thrust was demand of autonomy for East Pakistan is regarded as the turning point in Mujib's rise to charismatic leadership".

৭. ১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রভাব: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফার প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠে, তার প্রভাব পড়ে সত্তরের নির্বাচনে। আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেওয়ার জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছে। অপরদিকে ছয়দফা বিরোধী দলগুলোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। ডঃ কামাল হোসেন যথার্থই বলেছেন, "চূড়ান্তভাবে নির্ধারক নির্বাচনী ফলাফল ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও তাঁর ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে জনগণের সুস্পষ্ট রায়"।

৮. স্বাধীনতার বীজ নিহিত: ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে যে গণআন্দোলন গড়ে উঠে, ১৯৬৯ সালে তা ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। এ গণঅভ্যুত্থান ১৯৭১ সালে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় এবং শেষপর্যন্ত ন'মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তাই বলা যায় যে, ছয় দফার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

চ. পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ কী-না?

১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ৬ দফা দাবি উত্থাপিত হওয়ার পরপরই পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও তার দোসর শোষকগোষ্ঠী ছয় দফাকে পাকিস্তান ভাঙ্গার হাতিয়ার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিতে থাকে। এমনকি ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপন্থী ও বামপন্থী দলের নেতারাও ছয় দফাকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার দলিল রূপে আখ্যা দেয় এবং দেশের ঐক্য রক্ষার্থে জিহাদ ঘোষণা করে।

বস্তুতপক্ষে ছয় দফার কোথাও পাকিস্তান ভাঙ্গার অথবা পূর্ব পাকিস্তান কে পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন করার উল্লেখ ছিল না বা প্রস্তাবের প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান কখনো পাকিস্তান থেকে পৃথক হবার কথা ঘোষণা করেন নি। ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারি যে, এর প্রথম ও দ্বিতীয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা ছিল পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং ষষ্ঠ দফা ছিল পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও তাদের দোসররা ছয় দফাকে বিকৃত ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া যথার্থই বলেছেন, "ছয় দফা দাবি কোনদিনই পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি ছিল না। এটা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।"

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত ও শোষণের প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলায় স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। আর পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী কোন অবস্থাতেই ছয় দফাভিত্তিক দাবি মানতে রাজি ছিল না। তাই ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষে সরকার বাঙালিদের ওপর কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে। কিন্তু দুর্বার বাঙালি তাতে মাথা

নত না করে ৬ দফাভিত্তিক গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয় এবং শেষপর্যন্ত এ গণঅভ্যুত্থান সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জন করে। তাই বলা যায় যে, ছয় দফার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ ঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।
২। মওদুদ আহমদ (অনুবাদঃ জগলুল আলম), *বাংলাদেশ, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২।
৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'ছয় দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-০৪।
৪। সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়–
(ক) ঢাকায় (খ) চট্টগ্রামে
(গ) পিন্ডিতে (ঘ) লাহোরে।

২। ৬ দফায় সুপারিশ করা হয়–
(ক) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (খ) রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার
(গ) গভর্নরের শাসন (ঘ) এককেন্দ্রিক শাসন।

৩। মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত দাবি ছিল ৬ দফার মধ্যে–
(ক) ১ নম্বর দাবিতে (খ) ২ নম্বর দাবিতে
(গ) ৩ নম্বর দাবিতে (ঘ) ৫ নম্বর দাবিতে।

৪। ৬ দফার প্রতি ন্যাপের (ভাসানী)প্রতিক্রিয়া ছিল–
(ক) মৌন (খ) পক্ষে
(গ) বিপক্ষে (ঘ) কোনটাই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ৬ দফার মুদ্রা ও অর্থ এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ধারা বর্ণনা করুন।
২। ৬ দফার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩। ৬ দফা আন্দোলনের বিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪। ১৯৭০-এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে ৬ দফা কি প্রভাব ফেলেছিল?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা উত্থাপিত হয় তা আলোচনা করুন।
২। ৬ দফার বর্ণনা দিন। এ দফাগুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোচনাপূর্বক এর প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করুন।

পাঠ-৫

সাংস্কৃতিক নিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *সাংস্কৃতিক নিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *সাংস্কৃতিক নিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *এর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালে বৃটিশ-ভারত বিভক্তির মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫৫ শতাংশ এবং এদের ভাষা ছিল বাংলা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অপরদিকে পাকিস্তানের বাকি ৫৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং এদের মাত্র ৭.২% শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ক্ষমতাসীন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে মাত্র ৭ শতাংশের উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার এবং বাঙালির ওপর তা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সাথে সাথে হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতি মুছে ফেলার মাধ্যমে বাঙালিদের পাকিস্তানিকরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াই বাঙালির ওপর সাংস্কৃতিক নিবর্তন নামে খ্যাত।

ক. সাংস্কৃতিক নিবর্তনের কারণ

পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় রূপদান এবং বর্ণমালা ও সংস্কৃতির সংস্কারের পেছনে কতগুলো ভিত্তিহীন যুক্তি উত্থাপন করেছিল। যথা–

১. ঐতিহাসিক কারণ: বাংলা ভাষার ইসলামীরূপ তথা পাকিস্তানি রূপ দানের জন্য দোহাই দেয়া হলো ইতিহাসের। বলা হয়েছিল যে, অতীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়েছে।যেমন– মধ্যযুগে ইসলামী রূপ এবং ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি ভাষার উৎকর্ষ হয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারেই বর্তমানে বাংলা ভাষার পাকিস্তানি রূপ দেওয়া আবশ্যক।

২. রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠন: ১৯৪৭ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে পাকিস্তানের ৯০ শতাংশ মানুষ আরবি বুঝে। তাই আরবি হরফে বাংলা চালু হলে মানুষ পরস্পরকে বুঝতে পারবে এবং এতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠবে।

৩. বাংলা ভাষাকে পবিত্রকরণ: ১৯৪৯ সালে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাবের পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, বাংলা বর্ণমালায় কতিপয় সংস্কৃত বর্ণ রয়েছে সেগুলো হিন্দুরা ব্যবহার করে। তাই বাংলাকে সংস্কৃতমুক্ত তথা পবিত্র করার লক্ষে এ ভাষার বর্ণমালা সংস্করণের আবশ্যিকতা রয়েছে।

৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রে সার্বজনীন সহজ ভাষার প্রবর্তন: পূর্ববর্তী পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে আইয়ুব খান সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রে একটি সহজ ও সার্বজনীন ভাষা সৃষ্টির লক্ষে রোমান হরফে বাংলা ও উর্দু ভাষা প্রবর্তনের পদক্ষেপে নেয়।

৫. বাংলার বা পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে হিন্দুমুক্ত করণ: সরকার ১৯৬০-এর দশকে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর পেছনে যুক্তি দেখানো হয় যে, এগুলো হিন্দু সংস্কৃতিরই অংশ। আর পাকিস্তান একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রে এসব অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত অনাকাঙ্ক্ষিত।

৬. বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্তব্ধ করা: এ বিষয়টি পাকিস্তান সরকারি মহলের মুখ দিয়ে উদ্ধৃত না হলেও সরকারের এক হীন ষড়যন্ত্র ছিল বাংলা ভাষা সংস্কার ও উর্দু চালুর মাধ্যমে গোটা বাঙালি জাতিকে মুর্খ করে রাখা এবং বাঙালির জাতীয়তাবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মধ্যদিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ করা।

এসব কারণে ও উদ্দেশে পাকিস্তান সরকার ধাপে ধাপে বাঙালি জাতির ওপর সাংস্কৃতিক নির্যাতন চালাতে থাকে। অবশ্য বাঙালি জাতি সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের নিকট কখনো মাথা নত করেনি। পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক নিবর্তনের বিরুদ্ধে তারা প্রথম প্রতিবাদ এবং পরে জঙ্গী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

খ. সাংস্কৃতিক নিবর্তনের প্রক্রিয়া

১. বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার প্রবর্তন: পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রথম নির্যাতন শুরু হয় ভাষা পরিবর্তনের মাধ্যমে। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন চূড়ান্ত হলে জনমনে প্রশ্ন উঠে নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি হবে। ১৯৪৭ সালে যারা নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো তাদের অধিকাংশের ভাষা ছিল উর্দু। অথচ এরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ। অপরদিকে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশের (পূর্ববাংলার) ভাষা ও সাহিত্য ছিল বাংলা। তাই জনসংখ্যানুপাতে বাংলা হতে পারতো নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু শাসক মহল বাংলাকে হিন্দু ভাষা বলে আখ্যা দেয় এবং পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্রের পবিত্রতা রক্ষার্থে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতির মতামত উপেক্ষা করে তাদের ওপরে এ ভাষা নির্বিচারে চাপিয়ে দেয়।

দেশ বিভাগের পরপরই পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিত্য ব্যবহার্য খাম, ডাকটিকিট, রেলগাড়ির টিকিট, বিভিন্ন ধরনের ফরম প্রভৃতিতে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় লেখা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে প্রথমবারের মত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গৃহীত হয়। এর মধ্যদিয়েই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলা সফরে আসেন এবং তিনিও পূর্বের ন্যায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। শাসক মহলের এরূপ বাংলা বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলা দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠলে সরকার পুলিশ বাহিনী দ্বারা কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করার জন্য ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন করার সময় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে শহীদ হন। সরকার ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পূর্ববাংলায় দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে শাসক মহলের অপচেষ্টা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২. ভাষাগত সংস্কারের মাধ্যমে নির্যাতন: উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার অপচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি পশ্চিমা শাসকচক্র বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কার এবং বিদেশি ভাষায় বাংলা ভাষার রূপান্তর করার ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৪৭ সালে। এ বছর আরবি হরফে বাংলা লেখার পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফে লেখা বই পড়ানো শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য প্রাদেশিক সরকার একটি ভাষা-কমিটি গঠন করে। দেড় বছর পর ভাষা কমিটি বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ঙ, ঞ, ম, ষ, ঢ়, ক্ষ, ৎ, ঃ বর্ণ বাদ দিয়ে অ্যা বর্ণ যুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করে। উল্লেখ্য, বর্ণগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো এসব বর্ণ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। যেহেতু সংস্কৃত হিন্দুদের ভাষা, সেহেতু এসব বর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানের জন্য একটিমাত্র ভাষা উদ্ভাবনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দুকে সমন্বিত করা ও সংশোধিত রোমান হরফে লেখা। এ উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রস্তাব ছিল দু'টি : (১) যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নশ্ক বা রোমান হরফের উদ্ভাবন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের আর্থিক আনুকূল্য দেয়া। (২) মুদ্রণযোগ্য আদর্শ বর্ণমালা নির্ণয় করা, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর উপযোগী রোমান হরফের উদ্ভাবন করার জন্য ভাষাবিদদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করায়। সমসাময়িককালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা একাডেমীতে সদ্য পরিচালক পদে যোগ দিয়ে সৈয়দ আলী আহসান একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। উক্ত সেমিনারে উর্দু ও বাংলার সাধারণ শব্দগুলো খুঁজে জনপ্রিয় করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া বাংলা ভাষা উর্দু, ফারসি ও আরবি অভিধান এবং উর্দু ভাষার সংস্কৃত, পালি ও বাংলা শব্দের অভিধান তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। আলী আহসানের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে একটি ভাষা সংস্কার কমিটিও গঠিত হয় এবং কমিটি বাংলা বর্ণমালা থেকে ঙ–ণ, ঋ, ঌ, ৎ, ঞ, ঃ, ষ, ঈ, ী, ঊ, ূ বর্জন করা সহ অনেক সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব দেয়।

১৯৬৮ সালে পুনরায় রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ গৃহীত হয়। আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৬৯ সালে ভাষা পুনর্গঠনের লক্ষে "জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা"কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এ সংস্থা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে হাজার হাজার অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য জনগণের মধ্যে বিতরণ করে। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ তথা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শাসক মহল ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সংগঠন ও সংস্থা কর্তৃক বাংলা ভাষা সাহিত্য ও বর্ণমালার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাঙালির সংস্কৃতির মূলে কেবল আঘাত নয়, তাদের ধৃষ্টতাও বলা যায়।

৩. শিক্ষা সংকোচন নীতি: আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস.এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৬০ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে এবং রিপোর্টে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণের তথ্য প্রদান করে। এর ভিত্তিতে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পূর্ববাংলায় শিক্ষা সংকোচন নীতি অনুসরণ করে। সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, প্রতিটি স্কুলের ৬০ শতাংশ অর্থ সংগৃহীত হবে ছাত্র বেতন থেকে এবং ২০ শতাংশ অর্থ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্বাহ করবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার একই নীতি অনুসরণ করে। স্নাতক পর্যায়ে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের সময়গত পার্থক্য বিলোপ করা হয়। সরকারের এসব সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ পূর্ববাংলায় শিক্ষা বিস্তারকে স্থবির করে রাখা। কিন্তু পূর্ববাংলার ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে সরকার সমগ্র পূর্ববাংলায় ৭৪টি কলেজ, ১৪০০টি উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং ছাত্রদের গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করে।

৪. প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি: আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অপরাধে সরকার ১৯৬৬ সালে ইত্তেফাক সহ কতিপয় প্রগতিশীল পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে ইয়াহিয়া খানের চক্রান্তে বাংলা ভাষায় লিখিত কতগুলো পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এগুলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এছাড়া সরকার বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে বাঙালির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নগ্ন আঘাত হেনেছিল।

৫. রবীন্দ্র বিদ্বেষী তৎপরতা: বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র রচনাবলী, গান, নাটক প্রভৃতির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার পেছনে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক সরকার তাই রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রতি রুষ্টভাব পোষণ করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে বেতার ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের পর গণমানুষের চাপে সীমিত আকারে প্রচার অনুমোদিত হয়। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে পুনরায় বিতর্ক ওঠে। এ বছর ২০ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে সরকারি দলের নেতা আবদুস সবুর খান তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্র সঙ্গীতকে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অশুভ প্রয়াস বলে আখ্যা দেয়। গণপরিষদের ২২ জন সদস্য তা সমর্থন করেন। তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার কমিয়ে আনার ঘোষণা দেন এবং ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ইঙ্গিত প্রদর্শন দেন। বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র রচনাবলীর ওপর সরকারের এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্যদিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে আঘাত করেছিল।

৬. বাংলা উৎসব নিষিদ্ধকরণ: ১লা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম অংশ। সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম ১ বৈশাখ উৎসব চালু করেন এবং তখন থেকে পূর্ববাংলায় এ উৎসব প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু আইয়ুব খান ১৯৬৭ সালে ১ বৈশাখ পালনকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বলে আখ্যা দেন। মূলত আইয়ুব খানের এরূপ ঘোষণা ছিল বাঙালি জাতির শত বছরের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত।

গ. সাংস্কৃতিক নিবর্তনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া

পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপ বাঙালি জাতি কখনো নীরবে সহ্য করেনি। ক্ষমতাসীন সরকার যখনই অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছিল বাঙালি জাতি তখনই তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

১. পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস: ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপকের উদ্যোগে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এ সংগঠনটির (১৯৫৪ সাল পর্যন্ত) ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন এবং ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার এ সংগঠনটি। এ সংগঠনের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলা হয় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" এবং ১৯৪৮ সালে এটি "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" নামধারণ করে। তমদ্দুন মজলিস থেকে প্রকাশিত 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ব্যাপক জনমত ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি বাংলা ভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালে পূর্ববাংলায় যে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার পেছনে উৎসাহ জুগিয়েছিল এ তমদ্দুন মজলিস। ক্রমে ধর্মভিত্তিক রক্ষণশীল মতাদর্শের কারণে সংগঠনটি দুর্বল হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের পর তমদ্দুন মজলিস তার পূর্বের গতি হারিয়ে নিছক ব্যক্তির সংগঠনে পরিণত হয়। তারপরও ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ সংগঠনটির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

২. সংস্কৃতি সংসদ: ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক "সংস্কৃতি সংসদ" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। এটা ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী ধারার সাংস্কৃতিক সংগঠন। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সংগঠন পূর্ববাংলার ছাত্র-শিক্ষক-জনতার মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।

৩. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ: ১৯৫২ সালের শেষের দিকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে এটাই ছিল ১৯৪৭-উত্তরকালে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসংগঠিত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে কবি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। এ সংসদের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী, সংগঠক ও বুদ্ধিজীবীরা বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের এ পর্বে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনসমূহ ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক আন্দোলনে, বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

৪. সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক: দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক নামে পরপর দু'টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ দু'টি মিলিত হয়ে ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে পূর্ববাংলার ও ভারতের বহু কবি, সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলাকালে সংগঠন দু'টি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।

৫. কুমিল্লা প্রগতি মজলিস: পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লা প্রগতি মজলিস। এর প্রাণ-পুরুষ ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে কুমিল্লায় "পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা সম্মেলন এ দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর মূল অবদান ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী পূর্ববাংলার প্রবাহমান ঐতিহ্যে আস্থা রেখে, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে,

অসাম্প্রদায়িক, মানবমুখী ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করা– সম্মেলন এ মনোভাবকে পুষ্ট করেছে।

৬. কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন: বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার দাবি নিয়ে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের আগ্রাসন থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমন্বয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. ছায়ানটের ভূমিকা: পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কঠোর নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যেও ১৯৬১ সালে পালিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। এ প্রেক্ষাপটে বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ছায়ানট। এ প্রতিষ্ঠানে বাংলা সঙ্গীত চর্চা ও বাংলা উৎসবগুলো পালিত হতো। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছায়ানটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন 'এদেশের বাঙালী সংস্কৃতির প্রসার, সমৃদ্ধ রূপটি ছায়ানটের সাধনার মধ্যদিয়েই ষাটের দশক ধরে মূর্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

৮. বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের প্রতিক্রিয়া: পাকিস্তানের শাসক মহল কর্তৃক পূর্ববাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে পাকিস্তানের তেইশ বছরে পূর্ববাংলায় অনেকগুলো রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-এর দশকে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও ১৯৬০-এর দশকে সে স্থান দখল করে রাজনৈতিক দলগুলো। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তার ২১ দফা কর্মসূচিতে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি করে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের প্রণীত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলো তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৮ সালে ছাত্র সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে গঠন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। পরিষদ তাদের ১১ দফা দাবি নিয়ে পূর্ববাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং তাদের আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন আইয়ুব খানের পতনকে সুনিশ্চিত করে।

৯. বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়া: পূর্ববাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী মহলও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা, ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাতিল ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা

পূর্ববাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে তার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

বস্তুতপক্ষে ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়েই বাঙালি জাতি প্রথমবারের মত পাকিস্তানি শাসক মহলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং অস্ত্রধারণ করেছিল।এ ধরনের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যদিয়ে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটায়। পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দমননীতি বরং

ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলে। এ সময় একদিকে সরকারি দমননীতি অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ ঘটে। লেখক-সাহিত্যিকদের লেখনীর কারণে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ক্রমে বিকশিত হয়। প্রগতিশীল মহলের চিন্তাকে বিভিন্ন লেখকরা জাগিয়ে রাখেন। দোকানপাট, শিশুদের নামকরণে বাংলা শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার শুরু হয়। সিনেমা হলের নাম বাংলাকরণ যেমন– বলাকা, মধুমিতা, হংস, জোনাকি, রাখা শুরু হয়। সে সময়ে একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হয়ে দাঁড়ায় 'আবার তোরা মানুষ হ'/ অনুকরণ খোলস ভেদি কায়মনে বাঙালী হ'/ আবার তোরা মানুষ হ'।' এ জাতীয়তাবাদী চেতনা বাঙালি জাতিকে ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং ১৯৬৬ সালের ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। একইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্র সমাজ ১৯৬৯ সালে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো প্রগাঢ় হয় এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো বলিষ্ঠতা দান করে এবং একই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে ন'মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি বিজয় লাভ করে। এই সকল আন্দোলনে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্ড়ানি শাসক শ্রেণী চেয়েছিল বাঙালি জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে বাঙালিদের মূর্খ রেখে এ অঞ্চলে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনকে পাকাপোক্ত করতে। তাই সূচনা থেকেই তারা বিভিন্ন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখনই ক্ষমতাসীন দল এ ধরনের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তখনই বাঙালি জাতি তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আর এর ফলে একদিকে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি তার স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, অপরদিকে এরই মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। অবশেষে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১।

২। নীলিমা ইব্রাহিম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *মুক্তিসংগ্রাম, ১ম পর্ব*, ঢাকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।

৩। সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩।

৪। রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে প্রথমবারের মতো উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয় ১৯৪৭ সালের–

(ক) ১৪ আগস্ট (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি

(গ) ২৭ নভেম্বর (ঘ) ১৭ নভেম্বর।

২। ১ বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন–

(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (খ) আইয়ুব খান

(গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) নাজিমুদ্দিন।

৩। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় ১৯৪৭ সালের–

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি (খ) ১ নভেম্বর

(গ) ১ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২৫ নভেম্বর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। আইয়ুব খানের আমলে কিভাবে ভাষাগত সংস্কারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক নিবর্তন করা হয়?

২। আইয়ুবের আমলে রবীন্দ্র বিদ্বেষী তৎপরতা সম্পর্কে টীকা লিখুন।

৩। নিবর্তনের কারণে কিভাবে ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আইয়ুব খানের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক নিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানে এর প্রভাবসহ এর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৬

আগরতলা মামলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আগরতলা মামলার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *মামলার বিষয়বস্তু আলোচনা করতে পারবেন;*
- *মামলার আসামীদের পরিচয় অবগত হবেন;*
- *মামলার পেছনে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *মামলার বিচার প্রক্রিয়া ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *মামলার প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন;*
- *মামলার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন;*
- *১৯৭০ সালের নির্বাচনে এই মামলার* প্রভাব বিচার করতে পারবেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলের (১৯৫৮-৬৯) সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও প্রহসনমূলক ঘটনা। ১৯৬৬ সালে উত্থাপিত ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে যখন গণআন্দোলন জোরদার হতে থাকে তখনই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আন্দোলনকে স্তিমিত করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উৎখাত করার লক্ষে এ প্রহসনমূলক নীতি গ্রহণে তৎপর হন। পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্বশূন্য করে এ অঞ্চলে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ও প্রভাব সুদৃঢ় করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই ফল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। যদিও গণদাবির মুখে শেষপর্যন্ত এ মামলা তুলে নেওয়া হয় এবং আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে মামলার অসারতা প্রমাণিত হয়।

আগরতলা মামলার পটভূমি

আইয়ুব খান ছিলেন একজন স্বৈরাচারী সামরিক শাসক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে, বিশেষ করে বিরোধীদের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল ক্ষোভ। ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে সামরিক আইন জারি করেই দেশের জনগণের সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেন। দেশের উভয় অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক নেতাদের সামরিক আইনে গ্রেফতার করতে থাকেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানুষের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার হরণ করে নিয়ে দেশে একনায়কত্ব শাসনব্যবস্থা চালু করেন। আইয়ুব খান একদিকে ক্ষমতা বৈধকরণ অপরদিকে ক্ষমতাকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষে ১৯৬২ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামক বিশেষ কৌশল আবিষ্কার করেন। এবং এ প্রেক্ষাপটে সকল রাজবন্দির মুক্তি প্রদান করেন। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে

থাকেন। এরফলে শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক জান্তা আইয়ুবের প্রধান শত্রুতে পরিণত হন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুবের অধীনে দ্বিতীয় নির্বাচনেও শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল লক্ষণীয় যা আইয়ুব খানকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য পাহাড় পরিমাণ রূপ লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জনসভা ও বিবৃতির মাধ্যমে এ বৈষম্য জনসম্মুখে তুলে ধরে আইয়ুব বিরোধী শক্তিকে আরো বলীয়ান করে তুলতে থাকেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্লিপ্ততার বিষয়টি শেখ মুজিব ফলাও করে প্রচার করতে থাকেন। যুদ্ধোত্তর ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে পাকিস্তানের জাতীয় কনফারেন্সে শেখ মুজিব পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের বৈষম্য তুলে ধরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এ ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হলে আইয়ুব খান আরো বিচলিত হয়ে ওঠেন। বস্তুতপক্ষে, ৬ দফা দাবি আইয়ুবের পক্ষে মেনে নেওয়া কখনো সম্ভব ছিল না। তাই আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে ছয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। অপরদিকে ছয় দফা ভিত্তিক দাবি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এক গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

আইয়ুব খান ছয় দফা দাবি নস্যাৎ করার লক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আন্দোলনের পক্ষের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করতে থাকেন। এর প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছয় দফা আন্দোলন আরো গতিশীলতা লাভ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে পুলিশ কয়েকজনকে হত্যা করে এবং বহু লোক আহত হয়। কিছুদিন পরেই সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সংবাদপত্র ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার এবং ইত্তেফাকসহ কিছু কিছু পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক, সংবাদপত্রকর্মী এবং ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানায় ও ধর্মঘট পালন করে।

ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন যখন সর্বস্তরে প্রসারতা লাভ করেছিল তখনই সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ এবং আরবি হরফে বাংলা চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিল। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা আন্দোলন এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। সরকার এ গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষে বিভিন্ন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এরূপ হীন চক্রান্তেরই বাস্তব রূপায়ন।

মামলার বিষয়বস্তু

১৯৬৭ সালে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আন্দোলনকে স্তিমিত করার এক কূটকৌশল আবিষ্কার করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সি.এস.পি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা পূর্বের বছর অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে আগরতলায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ভারতীয়দের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। অভ্যুত্থান সফল করার জন্য তাঁরা ভারতীয়দের নিকট থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেন বলে অভিযোগ করা হয়। এই মর্মে অর্থ ও অস্ত্রের একটি তালিকাও তৈরি করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যে এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, গ্রেফতারকৃত

আসামীরা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে আরো তদন্ত চলছে। ৬ জানুয়ারি আসামীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ১৯৬৮ সালে ১৮ জানুয়ারি "ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার" অভিযোগ এনে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে পূর্বের ২৮ জন সহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা দায়ের করা হয়। এটাই "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামে খ্যাত।

মামলার আসামী

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি মামলার অধীনে চূড়ান্তভাবে প্রণীত আসামীদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ–

১. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
২. লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
৩. স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান (মাদারীপুর)
৪. প্রাক্তন এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহমদ (নোয়াখালী)
৫. এল.এস. নূর মোহাম্মদ (ঢাকা)
৬. জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি.এস.পি (ঢাকা)
৭. ফ্লাইট সার্জেন্ট মজিফুল্লাহ (নোয়াখালী)
৮. প্রাক্তন কর্পোরাল এ.সি. সামাদ (বরিশাল)
৯. প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন (বরিশাল)
১০. জনাব রুহুল কুদ্দুস সি.এস.পি. (খুলনা)
১১. ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)
১২. ভূপতি ভূষণ (মানিক) চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
১৩. বিধানকৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)
১৪. সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৫. মুজিবর রহমান ই.পি.আর.টি.সি.ক্লার্ক (কুমিল্লা)
১৬. সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৭. সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
১৮. মোহাম্মদ খুরশীদ (ফরিদপুর)
১৯. কে.এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি. (ঢাকা)
২০. রিসালদার শামসুল হক (ঢাকা)
২১. হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
২২. এস.এ.সি. মাহফুজ বারি (নোয়াখালী)
২৩. সার্জেন্ট শামসুল হক (নোয়াখালী)
২৪. মেজর শামসুল আলম (ঢাকা)
২৫. ক্যাপ্টেন মুত্তালিব (ময়মনসিংহ)
২৬. ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)

২৭. ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা (বরিশাল)

২৮. ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান

২৯. সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা)

৩০. মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)

৩১. লে. এম.এস.এম. রহমান (যশোর)

৩২. প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল)

৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্টিয়া)

৩৪. ক্যাপ্টেন খুরশীদ (ময়মনসিংহ)

৩৫. লে. আবদুর রউফ (ময়মনসিংহ)

এছাড়া আরো ১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয় যারা পরে রাজসাক্ষী হতে রাজী হওয়ায় মুক্তি পান। উপরোক্ত আসামীদের প্রথমে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে ১৮ জানুয়ারি দেশ রক্ষা আইন হতে মুক্তি দিয়ে 'আর্মি, নেভী এন্ড এয়ারফোর্স এ্যাক্ট'-এ পুনরায় গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় জেল হতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

মামলার উদ্দেশ্য

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পশ্চাতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের যে সকল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ–

১. পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নির্মূল করা।

২. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে এ মনোভাব জাগিয়ে দেওয়া যে বাঙালিরা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিভেদ ও ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দেওয়া।

৪. শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে নির্মূল করা।

৫. আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্তে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের ষড়যন্ত্রের কথা প্রচার করে রায় প্রদত্ত হলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উত্থান প্রচেষ্টা বন্ধ হবে। এবং গণসমর্থন সরকারের পক্ষে চলে আসবে। এর ফলে পরবর্তী নির্বাচনে আইয়ুব খান ও তাঁর কনভেনশন মুসলিম লীগের বিজয় সুনিশ্চিত হবে।

মামলার বিচার প্রক্রিয়া ও পরিণতি

ক. **আইনের সংশোধন:** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর তাদের প্রকাশ্যে বিচারের দাবি ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। সরকার ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল আগরতলা মামলার বিচার পরিচালনার জন্য আইন ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত এক ফৌজদারী অধ্যাদেশ জারি করেন। এতে বলা হয়–

   ১. মামলার বিচার সাধারণ আদালতের পরিবর্তে বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

   ২. সুপ্রিম কোর্টের একজন জজ (চেয়ারম্যান) এবং হাইকোর্টের দু'জন জজের (সদস্য) সমন্বয়ে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হবে।

৩. পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আইন সাবুদ হবে।

৪. আসামীদের কোন জামিন দেওয়া যাবে না এবং তাদেরকে সামরিক হেফাজতে রাখা হবে।

৫. বিশেষ আদালতের এখতিয়ার নিয়ে কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

খ. বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন ও মামলার অভিযোগ: ১৯৬৮ সালের ২২ এপ্রিল আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট মামলার বিচারের স্থান নির্ধারিত হয় এবং ১৯ জুন বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে মামলার শুনানি শুরু হয়। পূর্বের ফৌজদারী অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস.এ. রহমান ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম.আর. খান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মকসুমুল হাকিম এর সদস্য নিযুক্ত হন। প্রধান ফরিয়াদী হিসেবে থাকেন পাকিস্তানের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রখ্যাত পাঞ্জাবি আইনজীবী মঞ্জুর কাদের। অপরদিকে আসামীদের পক্ষ নেন ইংল্যান্ডের রাণীর আইন বিষয়ক উপদেষ্টা প্রখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়াম। এছাড়া তাদের পক্ষে ছিলেন ড. আলীম আল রাজী, আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান, জুলমত আলী, মোল্লা জালাল উদ্দিন ও মওদুদ আহমদসহ বহুসংখ্যক আইনজীবী।

সরকার দু'টি প্রধান খাতে ৪২ পৃষ্ঠার একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করেন। কয়েকটি পরিশিষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা, সাক্ষী, দলিলপত্রাদি, আলামত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছদ্মনাম সংযোজন করা হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, অভিযুক্তরা ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং তহবিলের সাহায্যে অনুষ্ঠেয় একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণ, অস্ত্র লেন-দেন সংক্রান্ত কিছু দলিলপত্র উত্থাপন করা হয় যা পরে তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এছাড়া আদালতে ১১ জনের নামের একটি তালিকা রাজসাক্ষী হিসেবে এবং ১২টি চিঠি, ২ কপি টেলিগ্রাম, 'বাংলাদেশ' ও 'বেতারবাণী' লেখা দু'টি তারিখ বিহীন কাগজ, অর্থ লেন-দেন সংক্রান্ত দলিল, ১০টি প্রবন্ধের একটি তালিকা এবং ২০০ সাক্ষীর নামসহ ৮২টি দলিল উত্থাপিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর অভিযুক্তদের পক্ষাবলম্বনকারীদের মামলা তৈরির সুযোগ দিয়ে প্রায় চার সপ্তাহের জন্যে মামলা মুলতবী রাখা হয়।

কিছুদিন পর মামলার বিচার শুরু হয়। আসামীদের জবানবন্দি ও সওয়াল-জবাব শুরু হয়। জবানবন্দিতে প্রথমেই শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলা সরকারের হীন ষড়যন্ত্র ও মামলাকে মিথ্যা বলে আখ্যা দেন এবং এতে তালিকাভুক্ত আসামীদের নির্দোষ দাবি করেন। এভাবে সকল আসামী নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। অপরপক্ষে রাজসাক্ষীদের অনেকেই গোপন কথা ফাঁস করে দেন এবং তাদের জোরপূর্বক সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে বলে স্বীকার করেন। এর ফলে বিচারকগণ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকেন। এর মধ্যদিয়ে শুনানী ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

একদিকে সাক্ষীদের মিথ্যা বলার অনীহা, অপরদিকে আসামীদের জোরালো প্রতিবাদের মুখে আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া শিথিল হয়ে আসে। আবার ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান নামক ছাত্রকে, ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলে আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করার প্রতিবাদে মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিজের দুর্বল অবস্থান অনুমান করতে

পেরে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও বন্দীদের নিঃশর্তে মুক্তি প্রদান করেন। এভাবে আগরতলা মামলা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক মামলা বলে প্রমাণিত হয়।

প্রতিক্রিয়া

আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত-আট মাস ধরে এ মামলার শুনানি ও জেরার কাজ চলছিল। এ সময় পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিনের মামলার বিচারের বিবরণ প্রচার করা হতো। পত্র-পত্রিকা পাঠে জনগণ উপলব্ধি করতে পারলো যে, পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। তাছাড়া বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীদের সাহসিকতা ও সরকারের দুর্বল অভিযোগ জনগণকে আরো উত্তেজিত ও সাহসী করে তোলে। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দেওয়ায় আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের ১১ দফা দাবির মধ্যে একটি প্রধান দাবি ছিল আগরতলা মামলার প্রত্যাহার ও আসামীদের নিঃশর্ত মুক্তিদান।

একদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফাভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন যখন জোরালো হতে থাকে ঠিক সে মুহূর্তে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" (ডাক) নামক সংগঠনের উদ্যোগে ৮ দফাভিত্তিক দাবি নিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়। এ আট দফার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল আগরতলা মামলায় বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য বন্দিদের মুক্তিদান, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং 'ডাক'-এর ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী এক গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। ডাক এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পৃথক পৃথকভাবে ১৭ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করে। এদিন ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের লাঠিচার্জে বহু ছাত্র আহত হয়। এরপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি থেকে প্রায় প্রতিদিন বিক্ষোভ চলতে থাকে। ১৮ জানুয়ারি ছাত্রদের ওপর হামলা এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্ররা জমায়েত হয় এবং মিছিল নিয়ে সমগ্র ঢাকা প্রদক্ষিণ করে। ঐদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে একটি মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চরম গতিশীলতা লাভ করে। ২১ জানুয়ারি ঢাকায় মশাল মিছিল বের করা হয় এবং ২৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। ঐদিন পুলিশের গুলিতে কিশোর ছাত্র মতিউর রহমানসহ কয়েকজন নিহত হয়। উত্তেজিত জনতা পাকিস্তান পন্থী পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ'-এর ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পূর্ববাংলার ঢাকা শহর সাময়িকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে আন্দোলন ১ দিনও থেমে থাকেনি। প্রতিদিন একদিকে হরতাল ধর্মঘট চলতে থাকে, অপরদিকে পুলিশি নির্যাতন গ্রেফতার ও হত্যা অব্যাহত থাকে।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং আসাদসহ অন্যান্যদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে তখন ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব এক বেতার ভাষণে বিরোধী দলীয়

নেতৃবৃন্দের সাথে গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানালে ছাত্র সমাজ তা প্রত্যাখ্যান করে। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব ঢাকা সফরে আসেন কিন্তু ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে তিনি ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান।

ফেব্রুয়ারি মাসের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে পাহারাদার সিপাহীরা গুলি করে হত্যা করে এবং আরেকজন বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট ফজলুল হকও গুলিবিদ্ধ হন। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে দেশে সহিংস আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঐদিন জনতার বিক্ষোভ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনতা এক পর্যায়ে একজন মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই বিক্ষোভ সমগ্র ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জনতা আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এস.এ. রহমানের বাসভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। সরকার আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি সমগ্র ঢাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি কার্ফ্যু জারি করা হয় এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করে। এছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নূরুল ইসলাম নামক একজন কিশোর ছাত্র আহত হয়।

ড. জোহার হত্যার সংবাদ ঢাকা পৌঁছুলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সরকার অবস্থা বুঝে ১৯ ফেব্রুয়ারি কারফিউ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ক্রমে সরকারি নীতি নমনীয় হয়ে আসে। ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আইয়ুব খান তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধনী বাতিল করে এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তিলাভ করে। এভাবে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরল গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং ঐদিনই তিনি ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক জনসভায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব লাভ করেন।

মামলার ফলাফল বা গুরুত্ব

পাকিস্তান সরকার যে লক্ষ নিয়ে আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারের পক্ষে এ মামলার ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে তথা সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখপাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য এ মামলার ফলাফল বা গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

প্রথমত, জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্বাস করার পরিবর্তে এ মামলাকে বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়কারী আন্দোলন দমন করার জন্য পাঞ্জাবিদের ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য করে। পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে পাঞ্জাবি শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। তারা ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, শেখ মুজিব অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হন এবং ছয় দফা ও ১১ দফা কর্মসূচি পূর্ববাংলায় সত্যিকারের গণদাবিতে পরিণত হয়। উক্ত মামলার বিবাদীপক্ষের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে স্বায়ত্তশাসন দাবি ও এর যৌক্তিকতা প্রচার করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণা ও বৈষম্যের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

তৃতীয়ত, আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান সরকারের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

চতুর্থত, আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এটা ছিল বাঙালিদের একটা বিরাট বিজয়।

১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রভাব

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আগরতলা মামলার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সরকার মামলায় অভিযুক্ত করে শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে পরবর্তী নির্বাচনে সফলকাম হবে এমন আশা করেছিল। কিন্তু এর ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ববাংলার জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে আগরতলা মামলা বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটি উদ্দেশ্যমূলক মামলা। তারা এটাও উপলব্ধি করল যে, পাকিস্তান সরকারের হাতে বাঙালিদের জীবন ও সম্পত্তি কখনোই নিরাপদ নয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে, '৭০ সালের নির্বাচনে তার সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সারসংক্ষেপ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘটনা।সরকার চেয়েছিল এ মামলার মাধ্যমে পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে দমিয়ে রেখে ক্ষমতা আরো দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সরকারি কূটকৌশল মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং সরকার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ ও মামলা প্রত্যাহারের মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক ৬ দফা, ১১ দফা তথা বাঙালিদের বিজয় অর্জিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।

২। আবদুর রউফ, *আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, ঢাকা, প্যাপিরাস, ১৯৯২।

৩। মওদুদ আহমদ (অনুবাদঃ জগলুল আলম), *বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আগরতলা মামলার আসামী সংখ্যা ছিল–
(ক) ২৮ জন (খ) ৩০ জন
(গ) ৩২ জন (ঘ) ৩৫ জন।

২। গ্রেফতারকৃতদের বিচার কাজ শুরু হয়–
(ক) হাইকোর্টে (খ) কুর্মিটোলা সেনানিবাসে
(গ) জজকোর্ট (ঘ) পশ্চিম পাকিস্তানে।

৩। এই মামলার চেয়ারম্যান ছিলেন–
(ক) বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (খ) বিচারপতি এস.এ. রহমান
(গ) বিচারপতি মকসুমুল হাকিম (ঘ) এস.আর. খান ।

৪। আসামীদের পক্ষে প্রধান আইনজীবী ছিলেন–
(ক) আতাউর রহমান খান (খ) জুলমত আলী খান
(গ) আবদুস সালাম খান (ঘ) টমাস উইলিয়াম।

৫। মামলা চলাকালে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে মামলার যে অন্যতম আসামী শহীদ হন তিনি হলেন–
(ক) ড. শামসুজ্জোহা (খ) জহুরুল হক
(গ) ফজলুল হক (ঘ) মোয়াজ্জেম হোসেন।

৬। জনগণের দাবির মুখে আগরতলা মামলা সরকার প্রত্যাহার করে ১৯৬৯ সালের–
(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারি (খ) ২১ জানুয়ারি
(গ) ২২ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ২১ মার্চ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।

২। আগরতলা মামলার পরিণতি কি হয়েছিল বিবরণ দিন।

৩। এই মামলার ফলাফল সংক্ষেপে লিখুন।

৪। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পেছনে এই মামলার কোন ভূমিকা ছিল বলে আপনি মনে করেন?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আগরতলা মামলা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন। এই মামলার প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৭

ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *এগার দফার রূপরেখার বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *এগার দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিস্তার আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এই আন্দোলনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পূর্বাঞ্চলের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলার ছাত্র সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক ও প্রশংসনীয়। তেমনি ১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে ছাত্র সমাজের ১১ দফাভিত্তিক গণআন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।

১১ দফার পটভূমি

পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে। সরকার ছাত্র আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করতে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত ছাত্র সমাজই জয়ী হয়। অর্থাৎ সরকার বাংলা ভাষার দাবি মেনে নেয়। পূর্ববাংলায় দ্বিতীয়বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের আপামর ছাত্র সমাজ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ছাত্র আন্দোলন আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯৬৬ সালে ৬ দফাভিত্তিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে সরকার ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন দমন করার লক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শেখ মুজিবুর রহমান সহ আরো অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করলে ছাত্র সমাজ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন তারা পূর্ববাংলায় ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ঐদিন পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়। বস্তুতপক্ষে ৭ জুন ছাত্র সমাজের ওপর পুলিশী নির্যাতন পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে আরো উত্তেজিত করে তোলে। ৭ জুনের পর সরকার

রবীন্দ্র সঙ্গীত ও দৈনিক ইত্তেফাক সহ কয়েকটি পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সাথে ছাত্র সমাজ একাত্ম হয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে।

৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় যখন ছাত্র জনতা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে তখনই সরকার আন্দোলনের গতিধারা স্তিমিত করার জন্য ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামক এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করতে থাকে। এ সময় একদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ অপরদিকে অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয়তায় পূর্ববাংলায় সরকার বিরোধী আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাঙালির এমনি সংকটময় মুহূর্তে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এদেশের ছাত্র সমাজ বিশেষত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দু'টি অংশ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। এ অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন) এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি (ছাত্রলীগ নেতা) তোফায়েল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) নাজিম কামরান চৌধুরী এবং অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রনেতা উক্ত কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। এ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেই পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১দফা দাবি প্রণীত হয়। এ ১১ দফা কর্মসূচির মধ্যে পূর্ববর্তী ৬ দফাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১১ দফার রূপরেখা

১ম দফা: এ দফায় ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি দাবি উত্থাপিত হয়। যথা–

ক. স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করা এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া।দেয়া দেয়া দেয়া

খ. শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করা এবং বেসরকারি উদ্যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দেয়া। এবং সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।

গ. প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ ক্লাস চালু করা।

ঘ. ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে এসকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা।

ঙ. হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক সাবসিডি হিসেবে প্রদান করা।

চ. হল ও হোস্টেলের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা।

ছ. মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা। অফিস আদালতে ভাষা বাংলা চালু করা। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

জ. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

ঝ. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজ পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করণসহ মেডিকেল ছাত্রদের ও নার্সদের সকল দাবি মেনে নেয়া।

ঞ. প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% কল বাতিল, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মেনে নেয়া।

ট. পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দেয়া এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করে একমাত্র সিমেস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপে-ামা দেয়া।

ঠ. টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে পৃথক 'ফ্যাকাল্টি' করা।

ড. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স' কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের অন্যান্য দাবি মেনে নেয়া।

ঢ. ট্রেন, স্টিমার ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখিয়ে শতকরা ৫০% ভাগ কম ভাড়ায় টিকিট দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের সুযোগ দেয়াসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বাসের ব্যবস্থা করা। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ৫০% কন্সেশন দেয়া।

ণ. চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করা।

ত. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া।

থ. শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল পূর্বক ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করা।

২য় দফা: প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৩য় দফা: এ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার সম্বলিত ৬টি দাবি উত্থাপিত হয়। যথা–

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

খ. দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করা।

গ. দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দু'অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকার আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা দিবে এবং এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

ঙ. ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রে বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব থাকবে এবং এক্ষেত্রে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারে প্রয়োজনীয় মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশ-জাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বহির্বিশ্বের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি রপ্তানি করার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে।

চ. পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদানসহ পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করা।

৪র্থ দফা: পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান পূর্বক সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫ম দফা: ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।

৬ষ্ঠ দফা: কৃষকের ওপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করা এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করা। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা এবং তহশিলদারের অত্যাচার বন্ধের ব্যবস্থা করাসহ পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা ধার্য করা এবং আখের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।

৭ম দফা: শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান এবং শিল্প, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কৃষকের স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করা।

৮ম দফা: পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

৯ম দফা: জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।

১০ম দফা: সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল পূর্বক জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করা।

১১তম দফা: দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করার দাবি।

১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের বিস্তার

এগার দফার দাবিগুলোতে সমাজের সব স্তরের মানুষের দাবি সন্নিবেশিত হওয়ায় ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে যখন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটি আন্দোলনের ডাক দেয় তখন সারা দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দেশের জনমত তখন এমন তীব্রভাবে আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছিল যে জানুয়ারির (১৯৬৯) তৃতীয় সপ্তাহে সরকারি ছাত্র সংগঠন হিসেবে পরিচিত এন.এস.এফ. দলে ভাঙ্গন ধরে এবং এর একাংশ এগার দফা আন্দোলনে যোগ দেয়।

ঊনসত্তরের গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল মূলত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে এবং ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ আগরতলা মামলার প্রত্যাহার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ তীব্র গণআন্দোলন অব্যাহত থাকে। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি যখন এগার দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার সাথে যুক্ত হয় 'ডাক'-এর আট দফাভিত্তিক আন্দোলন। উভয় দল ১৭ জানুয়ারি আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করে। ঐদিন সরকার দেশে ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ডাক' মিছিল নিয়ে বার লাইব্রেরির দিকে অগ্রসর হয় এবং পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। অপরদিকে সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সভা আহ্বান করে এবং ছাত্ররা মিছিল বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ও রায়ট কার থেকে লাল রঙের পানি নিক্ষেপ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি ঢাকা ও সারা পূর্ববাংলায় ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিন ছাত্ররা পুলিশের বাধা অমান্য করে মিছিল বের করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে একজন পুলিশ অফিসরের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন।

আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্র ও গণআন্দোলন আরো তীব্ররূপ লাভ করে। এর প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক দিনই হরতাল, প্রতিবাদ মিছিল চলতে থাকে। সরকার আন্দোলন স্তিমিত করতে পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু ছাত্র আহত ও নিহত হয়।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসও ছিল ঘটনাবহুল এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উত্তপ্তকর অবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে তখন ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বিরোধী দলীয় রাজনীতিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দিলে ছাত্র সমাজ আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে তা প্রত্যাখ্যান করে। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা সফরে আসলে সর্বত্রই প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনের জনসভায় আগরতলা মামলাসহ সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি এবং সকল কালো আইন বাতিলসহ আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান এবং ঘোষণা দিয়ে যান যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। তার এরূপ ঘোষণার কারণে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এর প্রতিবাদে ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাক-এর আহ্বানে সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ইতোমধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কৌশলগত কারণে ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক ঘোষণায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অগত্যা ২২ ফেব্রুয়ারি 'ফৌজদারী আইন' প্রত্যাহারপূর্বক আগরতলা মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলার আসামীদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করে। এর মধ্যদিয়ে ১১ দফা আন্দোলনের একটা বড় লক্ষ অর্জিত হয়। কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র-জনতা এক সম্বর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

২২ ফেব্রুয়ারির পর থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অনেকটা নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সমঝোতার লক্ষে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সর্বদা ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক দাবিতে অনড় থাকেন। অবশেষে ১০ মার্চ আইয়ুব খান এক গোল টেবিল বৈঠকে সংসদীয় নির্বাচন সংক্রান্ত দাবির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বস্তুতপক্ষে আইয়ুব খানের পদত্যাগের মধ্যদিয়েই ১১ দফাভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানের বিজয় সূচিত হয়। এরপরও ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন অব্যাহত থাকে। তবে আন্দোলনের গতি

অহিংসরূপে অগ্রসর হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা পর্যন্ত (১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর) অব্যাহত থাকে।

১১ দফা আন্দোলনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও গণমানুষের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যবহ অধ্যায় রচনা করে। বিভিন্ন দিক থেকে এ আন্দোলন ছিল গুরুত্বপূর্ণ-

১. ছয় দফার গুরুত্ব বৃদ্ধিঃ ছাত্র সমাজ তাদের ১১ দফা দাবির মধ্যে ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের যোগসূত্র রচিত হয় এবং যৌথভাবে দাবি আদায় সম্ভব হয়। ১৮ জানুয়ারি হতে আন্দোলন প্রধানত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

২. আন্দোলনে ঐক্য সৃষ্টিঃ ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলন বিস্তারের আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী কয়েকটি দল ছাড়া এর প্রতি অনেক দল সমর্থন দেয়নি। কিন্তু আসাদের শহীদ হওয়ার পর জামাত, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানায়। এর প্রতিবাদে বিরোধীদল পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে। এমন কি পিন্ডি ও করাচিতে ছাত্ররা ১১ দফার পক্ষে সহানুভূতি জানায়। সরকারি দল এন.এস.এফ.-এ ভাঙ্গন ধরে এবং একাংশ ১১ দফা সমর্থন দেয়।

৩. মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাঃ ১১ দফা দাবির মধ্যে ছাত্র সমাজ মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ সম্বলিত দাবি সংযুক্ত করে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়।

৪. দুর্বার গণআন্দোলন সৃষ্টিঃ ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে ছাত্র সমাজ ১১ দফাভিত্তিক এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এ গণআন্দোলন ১৯৬৯ সালে এক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

৫. আগরতলা মামলা প্রত্যাহারঃ ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি প্রদান করে এবং আলোচনার সূত্রপাত করে।

৬. আইয়ুব খানের পদত্যাগঃ আইয়ুব খান প্রবল প্রতাপের সাথে এক দশক সামরিক শাসন অব্যাহত রাখার পর অবশেষে ১৯৬৯ সালে প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদিক থেকে ১১ দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

৭. সংসদীয় গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার স্বীকৃতিঃ সামরিক সরকার আইয়ুব খান দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ গোল টেবিল বৈঠকে সংসদীয় গণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যদিও তা কার্যকর হয়েছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সময়। কিন্তু আইয়ুব খানের মতো সামরিক জান্তা কর্তৃক অনুরূপ স্বীকৃতি প্রকারান্তে গণআন্দোলনেরই বিজয় হয়েছিল।

৮. বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিঃ এগার দফায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া এগার দফা আন্দোলনে আইয়ুব খান কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো সুদৃঢ় হয়।

৯. অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি: ৬ দফার মত এগার দফায় বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি তুলে ধরা হয়। ফলে বাংলার মানুষ নিজেদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ আরো ভাল করে উপলব্ধি করে।

১০. শিক্ষার প্রসারের পথ উন্মুখ: ছাত্র সমাজ তাদের এগার দফায় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের কতিপয় দাবি তুলে ধরার মাধ্যমে পূর্ববাংলার শিক্ষার বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করেছে।

১১. রাজনীতিতে ছাত্রদের গুরুত্ব বৃদ্ধি: পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ১১ দফাভিত্তিক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা এবং দেশবাসীর প্রাণের দাবি সরকারের সম্মুখে তুলে ধরার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অঙ্গনে ছাত্র সমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিল।

১২. স্বাধীনতার বীজ নিহিত: ছাত্রদের দুর্বার আন্দোলনে আইয়ুবের পতনের পর সকল আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ১৯৭০ সালে নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অংশ ছিল ছাত্র ও তরুন। তাদের অবদান ও আত্মত্যাগের ফলে স্বল্প সময়ে বাঙালি স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে।

সারসংক্ষেপ

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র সমাজ তাদের ১১ দফা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই এগার দফায় দেশের সর্বস্তরের মানুষের দাবি স্থান পাওয়ায় ছাত্র সমাজ ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। আর এগার দফাভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানের চাপে সামরিক জান্তা আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান ও সর্বশেষে নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর মধ্যদিয়েই এগার দফা তথা ছাত্র সমাজের বিজয় সূচিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে ছাত্র সমাজ তাদের মর্যাদাসম্পন্ন স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। তাই ৬ দফার মতো এগার দফাও সকল আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়। ছাত্র সমাজ আন্দোলনের যে দীক্ষা ও কৌশল গ্রহণ করে তা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বাস্তবায়নের সুযোগ পায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪।

২। ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

৩। সালাহ্উদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭–১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ১১ দফা প্রণয়নের প্রাক্কালে ছাত্রদের আন্দোলনকে বেগবান করতে ডাকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে গঠিত সংগঠনের নাম কি–

(ক) ছাত্রলীগ (খ) ছাত্র ইউনিয়ন

(গ) ছাত্র পরিষদ (ঘ) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

২। ১১ দফা আন্দোলনের সময় ডাকসু'র সহ-সভাপতি ছিলেন–
(ক) তোফায়েল আহমেদ (খ) নাজিম কামরান চৌধুরী
(গ) মতিয়া চৌধুরী (ঘ) আবদুর রউফ।

৩। ১১ দফা কর্মসূচি প্রথম ঘোষিত হয় ১৯৬৯ সালের–
(ক) ৭ জুন (খ) ৫ জানুয়ারি
(গ) ৮ জানুয়ারি (ঘ) ১৭ জানুয়ারি।

৪। ১১ দফার মধ্যে আওয়ামী লীগের ঘোষিত ৬ দফা সন্নিবেশ করা হয়–
(ক) ২ নম্বর দফায় (খ) ৩ নম্বর দফায়
(গ) ১১ নম্বর দফায় (ঘ) ৭ নম্বর দফায়।

৫। ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনকালে সরকারি ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল–
(ক) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (খ) নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ
(গ) এন.এস.এফ. (ঘ) নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা।

৬। এগার দফা আন্দোলনের পক্ষে প্রথম শহীদ হন ছাত্রনেতা–
(ক) জহুরুল হক (খ) আসাদুজ্জামান
(গ) শামসুজ্জোহা (ঘ) তাদের মধ্যে কেউ নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলনের পটভূমি সংক্ষেপে লিখুন।

২। ১১ দফা আন্দোলন কিভাবে আইয়ুব খানের পতনকে ত্বরান্বিত করে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। সংক্ষেপে ছাত্রদের ১১ দফার বর্ণনা দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালা:

পাঠ-১: ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (খ)।

পাঠ-২: ১। (খ); ২। (ক); ৩। (ঘ); ৪। (গ); ৫। (ক); ৬। (খ)।

পাঠ-৩: ১। (খ); ২। (গ)।

পাঠ-৪: ১। (ঘ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (গ)।

পাঠ-৫: ১। (গ); ২। (খ); ৩। (গ)।

পাঠ-৬: ১। (ঘ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ঘ); ৫। (খ); ৬। (গ)।

পাঠ-৭: ১। (গ); ২। (ক); ৩। (খ); ৪। (খ); ৫। (গ); ৬। (খ)।